দ্বিতীয় অধ্যায়

দিব্য ভাব এবং দিব্য সেবা

শ্লোক ১

ব্যাস উবাচ

ইতি সম্প্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।
প্রতিপূজ্য বচস্তেষাং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ১ ॥

ব্যাসঃ উবাচ—ব্যাসদেব বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সম্প্রশ্ন**—সম্যক্ প্রশ্ন; **সংহৃষ্টঃ**—সম্যক্‌রূপে পরিতৃপ্ত; **বিপ্রাণাম্**—সেখানকার ঋষিদের; **রৌমহর্ষণিঃ**—রোমহর্ষণ ঋষির পুত্র উগ্রশ্রবা; **প্রতিপূজ্য**—তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে; **বচঃ**—বাক্য; **তেষাম্**—তাঁদের; **প্রবক্তুম্**—বিশেষভাবে বললেন; **উপচক্রমে**—প্রয়াস করলেন।

অনুবাদ

রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা (সূত গোস্বামী) শৌনকাদি ব্রাহ্মণদের সেই সব প্রশ্নে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সূত গোস্বামীকে ছ'টি প্রশ্ন করেছিলেন, এবং তাই তিনি একে-একে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

সূত উবাচ

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥ ২ ॥

সূতঃ—সূত গোস্বামী; **উবাচ**—বললেন; **যম্**—যাঁর; **প্রব্রজন্তম্**—সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে যখন গৃহ থেকে চলে যাচ্ছিলেন; **অনুপেতম্**—উপনয়ন অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে সংস্কারসাধন হওয়ার পূর্বেই; **অপেত**—অনুষ্ঠান না করেই; **কৃত্যম্**—কর্তব্য-কর্ম; **দ্বৈপায়নঃ**—ব্যাসদেব; **বিরহ**—বিচ্ছেদ; **কাতরঃ**—ভীত হয়ে; **আজুহাব**—আহ্বান করেছিলেন; **পুত্র-ইতি**—হে পুত্র; **তন্ময়তয়া**—সেইভাবে তন্ময়যুক্ত হয়ে; **তরবঃ**—সমস্ত বৃক্ষরাজি; **অভিনেদুঃ**—প্রত্যুত্তর করেছিল; **তম্**—তাঁকে; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূত**—জীব; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **মুনিম্**—মুনি; **আনতঃ অস্মি**—প্রণাম করি।

অনুবাদ

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেনঃ আমি সেই মহর্ষিকে (শুকদেব গোস্বামী) আমার প্রণতি নিবেদন করছি, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করার জন্য উপনয়ন অনুষ্ঠান হওয়ার আগেই গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পিতৃদেব শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর বিরহে কাতর হয়ে তাঁকে "হে পুত্র! হে পুত্র!" বলে আহ্বান করেছিলেন, তখন তাঁর ভাবনায় তন্ময় বৃক্ষরাজিও বিরহকাতর পিতার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে প্রত্যুত্তর করেছিল।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের বহু বিধি-বিধান পালন করতে হয়। তার একটি বিধি হচ্ছে, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের অভিলাষী শিক্ষার্থীকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হতে হবে এবং তাঁর কাছে দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে হবে। পবিত্র যজ্ঞোপবীত হচ্ছে আচার্যের কাছে বেদ-পাঠের উপযুক্ত যোগ্যতা লাভের স্বীকৃতি। শুকদেব গোস্বামীকে এই ধরনের পবিত্রীকরণ অনুষ্ঠান করতে হয়নি, কেন না তিনি তাঁর জন্মের সময় থেকেই মুক্ত পুরুষ ছিলেন।

সাধারণত মানুষের জন্ম হয় অজ্ঞানের অন্ধকারে, এবং পবিত্রীকরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার দ্বিতীয় জন্ম হয় বা দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়। কেউ যখন নতুন আলোক দর্শন করেন এবং পারমার্থিক উন্নতি লাভের পন্থা অনুসন্ধান করেন, তখন তিনি বৈদিক জ্ঞান আহরণ করার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হন। সদ্‌গুরু কেবল ঐকান্তিক তত্ত্বানুসন্ধানীকেই তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং তাকে উপনয়নের মাধ্যমে যজ্ঞোপবীত দান করেন। এইভাবে মানুষের দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ হয়। দ্বিজত্ব লাভের পর বেদ পাঠের যোগ্যতা অর্জন করা যায় এবং যথাযথভাবে বৈদিক জ্ঞান লাভ হলে বিপ্র হওয়া যায়। বিপ্র অথবা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ এইভাবে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করে এবং তারপর তিনি বৈষ্ণব স্তরে অধিষ্ঠিত হন। বৈষ্ণব স্তর হচ্ছে ব্রাহ্মণত্বের স্নাতকোত্তর। প্রগতিশীল ব্রাহ্মণকে অবশ্যই বৈষ্ণব হতে হয়, কেন না বৈষ্ণবই হচ্ছে যথার্থ আত্মজ্ঞানী, তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রথম থেকেই বৈষ্ণব ছিলেন; তাই তাঁর বর্ণাশ্রম প্রথা অবলম্বন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম লক্ষ্য হচ্ছে কলুষিত

মানুষকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা বৈষ্ণবে পরিণত করা। তাই কেউ যখন উত্তম-অধিকারী বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন, তখন তাঁর যে কুলেই জন্ম, হোক না কেন, তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হয়। সেই ভাবধারা গ্রহণ করেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যবন কুলজাত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্যের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বৈষ্ণবরূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সূত্রে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণাবলী স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিল। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু করার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। বৈষ্ণবের কৃপায় কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস ইত্যাদি নীচ-কুলোদ্ভূত মানুষেরাও সর্বোচ্চ পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হতে পারে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন শ্রীল সূত গোস্বামীর গুরুদেব, তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিদের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করার আগে তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ৩

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপয়ামি গুরুং মুনীনাম্ ॥ ৩ ॥

যঃ—যিনি; **স্বানুভাবম্**—অনুভবের দ্বারা যিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন; **অখিল**—সমগ্র; **শ্রুতি**—বেদ; **সারম্**—সার; **একম্**—অদ্বিতীয়; **অধ্যাত্ম**—অধ্যাত্ম; **দীপম্**—দীপ; **অতিতিতীর্ষতাম্**—অতিক্রম করতে ইচ্ছুক; **তমঃ অন্ধম্**—গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় অস্তিত্ব; **সংসারিণাম্**—জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদের; **করুণয়া**—অহৈতুকী করুণার প্রভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **পুরাণ**—মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত; **গুহ্যম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **তম্**—তাঁকে; **ব্যাস-সূনুম্**—ব্যাসদেবের পুত্র; **উপয়ামি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **গুরুম্**—গুরুদেব; **মুনীনাম্**—মহর্ষিদেব।

অনুবাদ

সংসাররূপ গভীর অন্ধকার উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে কৃপা করে যিনি স্বীয় প্রভাব-জ্ঞাপক সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারভূত অনুপম আত্মতত্ত্ব প্রকাশক দীপ-সদৃশ সর্বপুরাণ-রহস্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন, সেই মুনিগণের গুরু ব্যাস-তনয় শ্রীল শুকদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই প্রার্থনায় শ্রীল সূত গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভূমিকার সারমর্ম বিশ্লেষণ করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ ভাষ্য। শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সার-সংকলনরূপ বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্ম-সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। সেই সারবস্তুর প্রকৃত ভাষ্য হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত*। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন বেদান্ত-সূত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞ তত্ত্ববিদ, এবং তাই তিনি তাঁর ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* স্বীয় অনুভবের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। আর মোহাচ্ছন্ন জড় বিষয়াসক্ত যে সমস্ত মানুষ জড় জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার অতিক্রম করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রতি তাঁর অন্তহীন করুণা প্রদর্শন করার জন্য তিনি এই অতি গোপনীয় জ্ঞান দান করেছিলেন।

জড় বিষয়াসক্ত মানুষ যে সুখী হতে পারে না, সে সম্বন্ধে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ভব-বন্ধনে আবদ্ধ কোন জীবই—তা সে ব্রহ্মাই হোন অথবা একটি নগণ্য পিপীলিকাই হোক—কখনই সুখী হতে পারে না। সকলেই সুখী হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রভাবে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাই জড় জগতকে বলা হয় ভগবানের সৃষ্টির অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ। তবে জড় বিষয়াসক্ত অসুখী মানুষেরা কেবল সেখান থেকে বেরিয়ে আসার বাসনা করার মাধ্যমেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত তারা এত মূর্খ যে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। তাই তাদের উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যে উট কাঁটা চেবানোর ফলে তার ক্ষত-বিক্ষত মুখের রক্তের স্বাদকে কাঁটার স্বাদ মনে করে তা উপভোগ করে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে তা কাঁটার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত তার নিজের মুখেরই রক্ত। তেমনই, জড়বাদীদের কাছে তাদের নিজের রক্তের স্বাদ মধুর মতো মিষ্টি বলে মনে হয়, এবং যদিও সে নিরন্তর তার নিজের সৃষ্ট জড় বিষয়ের দ্বারা নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, তবুও সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। এই ধরনের জড়বাদীদের বলা হয় 'কর্মী'। এইরকম শত-সহস্র কর্মীর মধ্যে কেবল দু'-একজন জড় জগতের কার্যকলাপে পরিশ্রান্ত হয়ে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে। এই ধরনের বুদ্ধিমান মানুষদের বলা হয় 'জ্ঞানী'। বেদান্ত-সূত্র এই ধরনের জ্ঞানীদের জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যতে বিবেক-বর্জিত মানুষেরা বেদান্ত-সূত্রের অপব্যবহার করবে, এবং তাই তিনি এই বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যরূপে *ভাগবত-পুরাণ* প্রণয়ন করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে ব্রহ্ম-সূত্রের প্রাকৃত ভাষ্য। শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে, যিনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ, *শ্রীমদ্ভাগবত* দান করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্যক্তিগতভাবে তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তারপর তা বিশ্লেষণ করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর করুণার প্রভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী জীবদের কাছে ভাগবত-বেদান্ত-সূত্র সহজলভ্য হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্ত-সূত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্য। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ইচ্ছাকৃতভাবেই তা স্পর্শ করেননি, কেন না তিনি জানতেন যে বেদান্ত-সূত্রের এই স্বাভাবিক ভাষ্যটিকে বিকৃত করা সম্ভব হবে না। তিনি তাঁর *শারীরক-ভাষ্য* রচনা করেছিলেন, এবং তাঁর তথাকথিত অনুগামীরা *শ্রীমদ্ভাগবত* আধুনিক রচনা বলে তার প্রতি তাদের ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিরুদ্ধে মায়াবাদীদের এই অপপ্রচারের দ্বারা কখনই প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোক থেকেই বোঝা যায় যে 'মাৎসর্য' নামক জড় রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত পরমহংসদের জন্যই এই অপ্রাকৃত শাস্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ যে এক জড় সৃষ্টির অতীত শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের সেই নির্দেশ সত্ত্বেও মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। ঈর্ষাপরায়ণ মায়াবাদীরা কখনই *শ্রীমদ্ভাগবত* স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু যাঁরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শরণ গ্রহণ করতে পারেন, কেন না তা বর্ণনা করেছেন মুক্ত পুরুষ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী। তা হচ্ছে অপ্রাকৃত দীপবর্তিকা, যার দ্বারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে পরম তত্ত্বকে দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৪

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৪ ॥

নারায়ণম্—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে; **নমস্কৃত্য**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নরম্ চ এব**—এবং নারায়ণ ঋষিকে; **নরোত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ; **দেবীম্**—দেবী; **সরস্বতীম্**—জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে; **ব্যাসম্**— ব্যাসদেব; **ততঃ**—তারপর; **জয়ম্**—সংসার বিজয়ী; **উদীরয়েৎ**—উচ্চারণ করা।

অনুবাদ

সংসার-বিজয়ী গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চারণ করার পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নর-নারায়ণ ঋষি নামক ভগবৎ-অবতার, বিদ্যাদেবী সরস্বতী এবং ব্যাসদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এবং পুরাণসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় অস্তিত্বের অজ্ঞানতম অন্ধকার জয় করা। অনাদিকাল ধরে জড়-ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার ফলে জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে। এই জড় জগতে সে নিরন্তর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত, এবং নানা রকম পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও সে কখনই এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই

জীবন-সংগ্রামে সে যদি জয়ী হতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এইভাবে যারা ভবরোগ নিরাময় করতে চায়, তাদের অবশ্য বেদ এবং পুরাণ আদি শাস্ত্র গ্রন্থের শরণাগত হতে হবে। মূর্খ লোকেরা বলে যে, বেদের সঙ্গে পুরাণের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরাণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছে ভগবত্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে বেদেরই সংযোজন। সমস্ত মানুষই সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কিছু মানুষ সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, কিছু মানুষ রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, আর কিছু মানুষ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। পুরাণগুলি এমনভাবে বিভক্ত হয়েছে যে, যে কোনও শ্রেণীর মানুষই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং জড় জগতের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীল সূত গোস্বামী দেখিয়ে গেছেন, পুরাণ কীভাবে পাঠ করতে হয়। যে সমস্ত মানুষ বৈদিক শাস্ত্র এবং পুরাণের বাণী প্রচার করতে চান, তাঁদের পক্ষে এই পন্থা অনুসরণ করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে অমল পুরাণ, এবং যে সমস্ত মানুষ চিরতরে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাঁদের জন্যই এটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে।

শ্লোক ৫

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎকৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৫ ॥

মুনয়ঃ—হে ঋষিগণ; **সাধু**—প্রসঙ্গোচিত; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **অহম্**—আমি; **ভবদ্ভিঃ**—আপনাদের সকলের দ্বারা; **লোক**—জগৎ; **মঙ্গলম্**—মঙ্গল; **যৎ**—কেন না; **কৃতঃ**—করে; **কৃষ্ণ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সংপ্রশ্নঃ**—পরিপ্রশ্ন; **যেন**—যার দ্বারা; **আত্মা**—আত্মা; **সুপ্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

অনুবাদ

হে ঋষিগণ, আপনারা আমাকে যথার্থ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনাদের প্রশ্নগুলি অতি উত্তম, কেন না সেগুলি কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং তাই তা জগতের মঙ্গল সাধন করে। এই ধরনের পরিপ্রশ্নের দ্বারাই কেবল আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে বলা হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবতে* পরম সত্যই হচ্ছে জ্ঞাতব্য বিষয়। তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিদের প্রশ্নগুলি ছিল যথার্থ পরিপ্রশ্ন, কেন না সেগুলি ছিল পরমেশ্বর ভগবান, পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমস্ত বেদের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছেন তিনি। তাই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলিই হচ্ছে বৈদিক অনুসন্ধানের সারবস্তু।

সমগ্র জগৎ প্রশ্ন এবং উত্তরে পূর্ণ। পশু, পক্ষী, মনুষ্য—সকলেই নিরন্তর প্রশ্ন এবং উত্তরে ব্যস্ত। সকালবেলায় পাখিরা তাদের কুলায় প্রশ্ন এবং উত্তরে ব্যস্ত হয়, আবার সন্ধ্যাবেলায় তারা নীড়ে ফিরে প্রশ্ন এবং উত্তরে ব্যস্ত হয়। মানুষ রাত্রে গভীর নিদ্রায় যখন মগ্ন থাকে, সেই সময়টি ছাড়া সর্বক্ষণ সে হয় প্রশ্ন করে নয়ত উত্তর দেয়। বাজারের দোকানদারেরা প্রশ্ন-উত্তরে ব্যস্ত, বিচারালয়ে আইনজীবীরা প্রশ্ন-উত্তরে ব্যস্ত, আর স্কুল-কলেজে ছাত্ররাও প্রশ্ন-উত্তরে ব্যস্ত। সংসদে দেশনেতারা সকলে প্রশ্ন-উত্তরে ব্যস্ত; রাজনীতিবিদেরা এবং সাংবাদিকেরাও প্রশ্ন-উত্তরে ব্যস্ত। যদিও তারা সারা জীবন ধরে এইভাবে প্রশ্ন-উত্তর নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তবুও তারা প্রসন্ন হতে পারে না। আত্মার প্রসন্নতা কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমেই লাভ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের সবচাইতে অন্তরঙ্গ প্রভু, সখা, পিতা, পুত্র এবং প্রেমিক। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে আমরা প্রশ্ন এবং উত্তরের কত বিষয় উদ্ভাবন করেছি, কিন্তু তার একটিও আমাদের পূর্ণ প্রসন্নতা দান করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সব কিছুই কেবল ক্ষণিকের তৃপ্তিদান করতে পারে। তাই আমরা যদি পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হতে চাই, তা হলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হবে অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আমরা প্রশ্ন না করে অথবা উত্তর না দিয়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরের আলোচনা করে, তাই এই অপ্রাকৃত গ্রন্থটি পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে আমরা সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করতে পারি। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে সব রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা ধর্ম-বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর সার-সমষ্টি।

শ্লোক ৬

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৬ ॥

সঃ—সেই; **বৈ**—অবশ্যই; **পুংসাম্**—মানুষের জন্য; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **অধোক্ষজে**—ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত; **অহৈতুকী**—ফলভোগের বাসনা রহিত; **অপ্রতিহতা**—নিরবচ্ছিন্ন; **যয়া**—যার দ্বারা; **আত্মা**—আত্মা; **সুপ্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।

অনুবাদ

সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে।

তাৎপর্য

এইখানে শ্রীল সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ঋষিরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম বিশ্লেষণ করতে এবং তার মূল তত্ত্বটি দান করতে, যাতে কলিযুগের অধঃপতিত মানুষেরা তা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। বেদে মানুষের জন্য দুটি মার্গ বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ অথবা ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের পন্থা, এবং অন্যটি হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ অথবা ইন্দ্রিয়-সুখ ত্যাগের পন্থা। প্রবৃত্তি মার্গ হচ্ছে নিকৃষ্ট, এবং পরমেশ্বর ভগবানের জন্য ইন্দ্রিয়-সুখ ত্যাগ করার পন্থা নিবৃত্তি মার্গ হচ্ছে উৎকৃষ্ট পন্থা। জড়জাগতিক জীবন হচ্ছে জীবের একটি রোগগ্রস্ত অবস্থা। প্রকৃত জীবন হচ্ছে পারমার্থিক জীবন বা ব্রহ্মভূত অবস্থা, যেখানে জীবন নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। জড় জীবন অনিত্য, মোহাচ্ছন্ন এবং দুঃখময়। এই জীবনে কোন রকম আনন্দ নেই। এখানে যা রয়েছে, তা হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার অর্থহীন প্রচেষ্টা এবং সেই সাময়িক দুঃখ-নিবৃত্তিকেই বলা হয় সুখ। তাই অনিত্য, অজ্ঞান এবং নিরানন্দময় জড় সুখভোগের উন্নতিসাধন করার যে প্রচেষ্টা, তা নিকৃষ্ট। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি, যা মানুষকে নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবনের দিকে পরিচালিত করে, তা অবশ্যই অনেক উন্নত মার্গ। এই ভক্তি কখনো কখনো নিকৃষ্ট স্তরের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলুষিত হয়ে পড়ে। যেমন, জড়জাগতিক লাভের আশায় ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার যে প্রয়াস তা নিবৃত্তি মার্গে অগ্রসর হওয়ার পথে একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। পরম মঙ্গল সাধনের জন্য বিষয়বাসনা ত্যাগ করা অবশ্যই অনেক উন্নত স্তরের বৃত্তি। বিষয়-সুখ কেবল ভবরোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। তাই ভগবদ্ভক্তি সব সময় বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, অর্থাৎ তাতে যেন জড় সুখভোগের কোন রকম বাসনা মিশ্রিত না থাকে। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সব রকমের জড় সুখভোগের কামনা-বাসনা রহিত হয়ে, সকাম কর্মের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের প্রয়াস রহিত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির উন্নত পন্থা অবলম্বন করা। এইভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল নিত্য আনন্দ লাভ করা যায়।

আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই ধর্মকে বৃত্তি বলে অভিহিত করেছি, কেন না ধর্ম কথাটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে "অস্তিত্ব বজায় রাখার পন্থা।" জীবের অস্তিত্বের সার্থকতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত হয়ে কর্ম করা। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের মূল আশ্রয়, এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত নিত্য বস্তুর পরম নিত্য পুরুষ, এবং সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে পরম চেতন পুরুষ। প্রতিটি জীবই তাই স্বরূপে নিত্য, এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাদের সকলের নিত্য আকর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম, এবং অন্য সব কিছুই হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমস্ত জীবের সম্পর্ক

হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। সেই অস্তিত্ব হচ্ছে চিন্ময় এবং তা আমাদের জড় জগতের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার সম্পর্ক। ভগবদ্ভক্তির মার্গে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সকলের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। তার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে তার যথার্থ জীবন সম্বন্ধে অবগত হয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রসন্ন হতে পারবে।

শ্লোক ৭

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥ ৭ ॥

বাসুদেবে—শ্রীকৃষ্ণকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তিযোগ; **প্রয়োজিতঃ**—অনুষ্ঠিত; **জনয়তি**—উৎপাদন করে; **আশু**—অচিরে; **বৈরাগ্যম্**—বিষয়ে বিরক্তি; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **যৎ**—যা; **অহৈতুকম্**—কোন রকম ফলের বাসনারহিত।

অনুবাদ

ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।

তাৎপর্য

যারা মনে করে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ভাবুকের ভাব-প্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়, তারা তর্ক উত্থাপন করে বলতে পারে যে, শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, তপশ্চর্যা, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি পারমার্থিক উপলব্ধির বহু পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। তাদের মতে, যারা উচ্চস্তরের কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারে না, তাদের জন্যই ভগবদ্ভক্তির পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। অনেকে আবার বলে যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা শূদ্র, বৈশ্য এবং স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু তাদের এই উক্তির কোনও সত্যতা নেই। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে সমস্ত পারমার্থিক কার্যকলাপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং তাই এই পন্থা মহিমান্বিত এবং তা অত্যন্ত সরল। যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার প্রয়াসী, তাদের কাছে এই পন্থা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং ভক্তিযোগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন যে সমস্ত নবীন ভক্ত, তাঁদের কাছে এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার এই পন্থাটি একটি মহৎ বিজ্ঞান, এবং তা প্রতিটি জীবের জন্যই উন্মুক্ত। এমন কি স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রের থেকেও নিম্নস্তরে রয়েছে যে সমস্ত অন্ত্যজ, তাদের সকলের জন্যই ভগবদ্ভক্তির দ্বার উন্মুক্ত। সুতরাং, উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ এবং আত্মজ্ঞানী রাজাদের

আর কি কথা। অন্য যে সমস্ত পন্থা বেদে নির্দেশিত হয়েছে, যথা—যজ্ঞ, দান, তপশ্চর্যা ইত্যাদি, তা সবই ভগবদ্ভক্তির আনুষঙ্গিক ক্রিয়া।

জ্ঞান এবং বৈরাগ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতির পথে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পারমার্থিক পথ জড় এবং চিন্ময়—উভয় বিষয়েই পূর্ণ জ্ঞান দান করে, এবং এইভাবে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে মানুষ জড়-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পারমার্থিক কার্যকলাপে আগ্রহান্বিত হয়। জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত নিষ্ক্রিয়তা নয়, যা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে থাকে। 'নৈষ্কর্ম' কথাটির অর্থ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ত্যাগ করা। ত্যাগ বলতে প্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগের কথা বলা হচ্ছে না। তেমনই, জড় বিষয় ত্যাগ বলতে জীবের যথার্থ কর্ম-ত্যাগের কথা বলা হচ্ছে না। ভক্তি-মার্গের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া। যখন বাস্তব বস্তুকে জানা যায়, তখন অবাস্তব বিষয়গুলি আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। তাই বাস্তব বস্তুর প্রতি বাস্তবভাবে সেবাযুক্ত হওয়ার ফলে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় এবং তখন জীব আপনা থেকেই নিকৃষ্ট বিষয়ের প্রতি নিরাসক্ত হয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই সে উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়। তেমনই, ভগবদ্ভক্তি জীবের পরম বৃত্তি হওয়ার ফলে তা মানুষকে জড় জগতে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত করে। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। তিনি মূর্খ নন অথবা তিনি নিকৃষ্ট স্তরের কার্যকলাপে যুক্ত নন, অথবা তাঁর কোন জাগতিক আসক্তিও নেই। শুষ্ক যুক্তি-তর্ক দিয়ে এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না। তা সম্ভব হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই। অর্থাৎ, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞান বৈরাগ্য আদি সব ক'টি দিব্য গুণই বর্তমান থাকে, কিন্তু জ্ঞান থাকলেই অথবা অনাসক্ত হলেই ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব জানা যায় না। ভক্তিই হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি।

শ্লোক ৮

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥ ৮ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **স্বনুষ্ঠিতঃ**—ব্যক্তিগত অবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত; **পুংসাম্**—মানুষদের; **বিষ্বক্সেন**—পরমেশ্বর ভগবান; **কথাসু**—বাণীতে; **যঃ**—যা; **ন**—না; **উৎপাদয়েৎ**—উৎপাদন করা; **যদি**—যদি; **রতিম্**—আসক্তিরূপ রুচি; **শ্রমঃ**—অনর্থক পরিশ্রম; **এব**—কেবল; **হি**—অবশ্যই; **কেবলম্**—সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।

তাৎপর্য

মানুষের বিভিন্ন রকমের প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন রকমের ধর্ম রয়েছে। জড় বিষয়াসক্ত যে মানুষ তার স্থূল জড় শরীরটির ঊর্ধ্বে আর কিছুই দর্শন করতে পারে না, তার কাছে তার ইন্দ্রিয়ের অতীত আর কিছুই নেই। তাই তার বৃত্তিগত কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত ও প্রসারিত স্বার্থপরতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কেন্দ্রীভূত স্বার্থপরতা দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে—যা সাধারণত নিম্ন স্তরের পশুদের মধ্যে দেখা যায়; আর প্রসারিত স্বার্থপরতা মানব সমাজে দেখা যায় এবং তা পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে স্থূল দেহের বিষয়গত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিষয়ে প্রসারিত হয়। এই সমস্ত স্থূল জড়বাদীদের ঊর্ধ্বে রয়েছে মনোধর্মীরা, যারা তাদের মনোরাজ্যে বিচরণ করে এবং তাদের বৃত্তিগত কার্যকলাপ হচ্ছে কবিতা রচনা করা বা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করা, যেগুলি হচ্ছে দেহ এবং মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বার্থপরতা। কিন্তু এই দেহ এবং মনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন সুপ্ত আত্মা, দেহে যাঁর অনুপস্থিতির ফলে দেহগত এবং মনোগত স্বার্থপরতাই অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আত্মার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই।

যেহেতু মূর্খ মানুষদের আত্মা সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই এবং যেহেতু তারা জানে না যে আত্মা দেহ এবং মনের অতীত, তাই তারা তাদের বৃত্তি অনুসারে কর্ম করেও তৃপ্ত হতে পারে না। আত্মার তৃপ্তি বা প্রসন্নতা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্থাপন এখানে করা হয়েছে। আত্মা স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মনের অতীত। দেহ এবং মনকে সক্রিয় করে আত্মা। সুপ্ত আত্মার প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে শুধুমাত্র দেহ এবং মনের চাহিদাগুলি মিটিয়ে কখনই সুখী হওয়া যায় না। দেহ এবং মন হচ্ছে বাহ্যিক আবরণ। আত্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য আত্মার প্রয়োজনগুলি মেটাতে হবে। একটি পাখির খাঁচা পরিষ্কার করে যেমন পাখিটিকে আনন্দ দান করা যায় না, তেমনই দেহ এবং মনের প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে আত্মাকে আনন্দ দান করা যায় না। পাখিটিকে আনন্দ দান করতে হলে যেমন তার প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে জানতে হবে, ঠিক তেমনই আত্মাকে আনন্দ দান করতে হলে আত্মার প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে অবগত হতে হবে।

আত্মার প্রয়োজন হচ্ছে এই জড় জগতের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। সে চায় এই ব্রহ্মাণ্ডের আবরণগুলি ভেদ করে বেরিয়ে যেতে। সে চায় মুক্তির আলোক এবং মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে। সেই মুক্তি সে তখনই লাভ করতে পারে, যখন সে পূর্ণ আনন্দময় পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়। সকলের হৃদয়েই ভগবানের প্রতি সুপ্ত প্রেম রয়েছে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় বস্তুর প্রতি জীবের যে আসক্তি, তা জড় দেহ এবং মনের মাধ্যমে চিন্ময় ভগবৎ-প্রেমেরই বিকৃত প্রকাশ। তাই আমাদের স্বধর্মপরায়ণ হতে হবে, যাতে আমরা আমাদের হৃদয়ে দিব্য চেতনার বিকাশ করতে পারি। তা সম্ভব হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত

কার্যকলাপের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে, এবং যে ধর্ম বা বৃত্তিগত কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রতি আসক্তির উদয় হয় না, তাকে এখানে 'শ্রম এব হি কেবলম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, অন্য সমস্ত ধর্ম (তা সে যে মতবাদের অন্তর্গত হোক্ না কেন) আত্মাকে মুক্তিদান করতে পারেনা। এমন কি মুক্তিকামীদের কার্যকলাপও অর্থহীন বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কেন না তারা সমস্ত মুক্তির উৎস যে মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারছে না। স্থূল জড়বাদীরা দেখতে পায় যে, তাদের সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয়গুলি সময় এবং স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা সে এই জগতেই হোক অথবা অন্য জগতেই হোক; এমন কি সে যদি স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, সেখানেও সে তার অতৃপ্ত আত্মার আবাস-স্বরূপ কোন নিত্য স্থিতি লাভ করতে পারে না। অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি-সাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা।

শ্লোক ৯

ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥

ধর্মস্য—ধর্মের; **হি**—অবশ্যই; **আপবর্গ্যস্য**—পরম মুক্তি; **ন**—না; **অর্থঃ**—অর্থ; **অর্থায়**—জাগতিক লাভের জন্য; **উপকল্পতে**—উদ্দেশ্য; **ন**—না; **অর্থস্য**—জড় বিষয় লাভের; **ধর্ম-এক-অন্তস্য**—পরম ধর্ম আচরণকারী; **কামঃ**—ইন্দ্রিয়-সুখভোগ; **লাভায়**—ফল লাভ; **হি**—যথার্থ; **স্মৃতঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে চরম মুক্তি লাভ করা। তা কখনো জড় বিষয় লাভের আশায় অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। অধিকন্তু, তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, যাঁরা পরম ধর্ম অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যেন কখনই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উদ্দেশ্যে জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশী না হন।

তাৎপর্য

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলনের ফলে আপনা থেকেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি রহিত হয়। কিন্তু বহু লোক আছে, যারা মনে করে যে সমস্ত কার্যকলাপেরই একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক বিষয় লাভ; এমন কি ধর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্যও তাই। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জনসাধারণ জাগতিক লাভের আশাতেই কেবল ধর্ম অনুষ্ঠান করে। এমন কি বৈদিক শাস্ত্রেও, সব রকমের ধর্ম আচরণের সঙ্গে

জড়-জাগতিক লাভের প্রলোভনও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এবং অধিকাংশ মানুষই ধর্ম আচরণের মাধ্যমে এই সমস্ত লাভের প্রতি অথবা প্রলোভনগুলির প্রতি আসক্ত। তথাকথিত ধর্মপরায়ণ মানুষদের কেন এই ধরনের জড় বিষয় লাভের প্রলোভন দেখানো হয়েছে? কেন না, জড় বিষয় লাভের ফলে তাদের ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের বাসনা পূর্ণ হয়। এই ধরনের তথাকথিত ধর্ম অনুশীলনের ফলে বিষয় লাভ হয়, এবং বিষয় লাভের ফলে জড় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা যায়। ইন্দ্রিয়-সুখভোগই হচ্ছে সকাম কর্মীদের সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রীল সূত গোস্বামীর মতে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত অনুসারে এই শ্লোকে তা বাতিল করা হয়েছে।

কেবল জড় বিষয় লাভের উদ্দেশ্যে কখনই কোন রকম ধর্ম-আচরণ করা উচিত নয়। জড় বিষয় লাভ হলেও তা ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। জড় বিষয় কীভাবে উপযোগ করা উচিত তা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১০

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥ ১০ ॥

কামস্য—কামনা-বাসনার; **ন**—না; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সমূহ; **প্রীতিঃ**—প্রীতি; **লাভঃ**—লাভ; **জীবেত**—জীবন-ধারণ; **যাবতা**—যতটুকু পরিমাণ; **জীবস্য**—জীবের; **তত্ত্ব**—পরম-তত্ত্ব; **জিজ্ঞাসা**—জিজ্ঞাসা; **ন**—না; **অর্থঃ**—অর্থ; **যঃ চ ইহ**—তা ছাড়া; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয় সুখভোগকে কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা অথবা আত্মাকে নির্মল রাখার বাসনাই কেবল করা উচিত, কেন না মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন জাগতিক সভ্যতা আজ ভ্রান্তভাবে বিষয়-ভোগের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এই ধরনের সভ্যতায়, জীবনের প্রতিটি স্তরে বিষয়-ভোগই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিতে, সমাজ-সেবায়, পরার্থবাদে, লোকহিতৈষণায় এবং চরমে ধর্ম অনুষ্ঠানে, এমন কি মুক্তির আকাঙ্ক্ষাতেও সেই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত অবস্থায় বর্তমান। রাজনীতির ক্ষেত্রে গণনেতারাও তাদের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রয়াসে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে। ভোটদানকারী জনসাধারণও, যে নেতা তাদের সব চাইতে বেশি ইন্দ্রিয়-সুখভোগের

আশ্বাস দিচ্ছে, তাকেই ভোট দিচ্ছে। ভোটদানকারী জনসাধারণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির যখন বিঘ্ন ঘটছে, তখন তারা নেতাদের গদিচ্যুত করছে। নেতারা সর্বদাই ভোটদানকারীদের নিরাশ করছে, কেন না তারা তাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভোটদানকারীদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করতে পারছে না। সমস্ত ক্ষেত্রেই এটা চলছে; জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। এমন কি যারা মুক্তির কামনা করছে, তারাও তাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য পরম-তত্ত্ব বা ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে তাদের সত্তা বা আত্মাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করা উচিত নয়। কেবল জীবন ধারণের জন্য যতটুকু বিষয় ভোগের প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত, ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য নয়। দেহটি যেহেতু ইন্দ্রিয় দিয়ে গঠিত, সেই জন্য তার অন্তত কিছু পরিমাণ বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলতে হবে। উচ্ছৃঙ্খলভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগ করা উচিত নয়। যেমন, সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের জন্য বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনের পন্থা রয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য তা নির্দিষ্ট হয়নি। আজকের সমাজে সংযমের অভাব বলেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের এত পরিকল্পনা করতে হচ্ছে, কিন্তু মূর্খ লোকেরা জানে না যে পরম সত্যের অনুসন্ধান যখন শুরু হয়, তখন জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আপনা থেকেই সাধিত হয়। যাঁরা পরম সত্যের অনুসন্ধানী, তাঁরা কখনই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের অর্থহীন কার্যকলাপে আকৃষ্ট হন না। কেন না তাঁরা পরম সত্যের অনুসন্ধানে সর্বদাই মগ্ন। তাই জীবনের প্রতিটি স্তরেই মানুষের পরম সত্যের অনুসন্ধান করা উচিত এবং তার ফলেই কেবল মানুষ সুখী হতে পারবে, কেন না সে তখন ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বিভিন্ন প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়। পরম সত্য যে কি তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥

বদন্তি—তাঁরা বলেন; **তৎ**—তাকে; **তত্ত্ব-বিদঃ**—তত্ত্বজ্ঞানীরা; **তত্ত্বম্‌**—পরম-তত্ত্ব; **যৎ**—যা; **জ্ঞানম্‌**—জ্ঞান; **অদ্বয়ম্‌**—অদ্বিতীয়; **ব্রহ্ম ইতি**—ব্রহ্ম নামে অভিহিত; **পরমাত্মা ইতি**—পরমাত্মা নামে অভিহিত; **ভগবান্‌ ইতি**—ভগবান নামে অভিহিত; **শব্দ্যতে**—শব্দিত হয় অর্থাৎ কথিত হয়।

অনুবাদ

যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।

তাৎপর্য

পরম-তত্ত্ব দৃশ্য এবং দ্রষ্টা উভয়ই, এবং গুণগতভাবে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান গুণগতভাবে অভিন্ন। উপনিষদের অনুগামী জ্ঞানীদের কাছে তা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয়, যোগীদের কাছে পরমাত্মা বা হিরণ্যগর্ভরূপে উপলব্ধ হন এবং ভক্তদের কাছে ভগবানরূপে প্রকাশিত হন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবান অথবা পরম ঈশ্বর হচ্ছেন পরম-তত্ত্বের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের আংশিক প্রকাশ, এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের রশ্মিচ্ছটা, যেমন সূর্যকিরণ হচ্ছে সূর্যদেবের রশ্মিচ্ছটা। এই মার্গগুলির অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা কখনও কখনও তাদের পন্থার স্বপক্ষে তর্ক করে, কিন্তু যাঁরা যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা, তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে উপরোক্ত তিনটি তত্ত্বই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সেই একই পরম-তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, পরম সত্য হচ্ছেন অভিজ্ঞ, স্বরাট এবং আপেক্ষিক জগতের সব রকম মোহ থেকে মুক্ত। আপেক্ষিক জগতে জ্ঞাতা জ্ঞেয় থেকে ভিন্ন, কিন্তু অদ্বয়-তত্ত্বে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক এবং অভিন্ন। আপেক্ষিক জগতে জ্ঞাতা হচ্ছেন চেতন আত্মা, উৎকৃষ্ট শক্তি, আর জ্ঞেয় হচ্ছে জড় পদার্থ বা নিকৃষ্ট শক্তি। তাই সেখানে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট শক্তির দ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু চিন্ময় জগতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়েই উৎকৃষ্ট শক্তি। পরম শক্তিমানের তিন রকমের শক্তি রয়েছে। শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবে তার প্রকাশের তারতম্য রয়েছে। চিন্ময় জগৎ এবং চেতন আত্মা উভয়েই উৎকৃষ্ট শক্তিজাত, কিন্তু জড় জগৎ ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তিজাত। জীব যখন নিকৃষ্ট প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন সে নিজেকে নিকৃষ্ট শক্তির অন্তর্গত বলে মনে করে মোহাচ্ছন্ন হয়। তাই এই জড় জগতে আপেক্ষিকতা অনুভূত হয়। চিন্ময় স্তরে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এবং তাই সেখানে সব কিছুই হচ্ছে পরম-তত্ত্ব।

শ্লোক ১২

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ ১২ ॥

তৎ—তা; **শ্রদ্দধানাঃ**—ঐকান্তিকভাবে জিজ্ঞাসু; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য; **যুক্তয়া**—সমন্বিত; **পশ্যন্তি**—দেখেন; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **শ্রুত**—বেদসমূহ; **গৃহীতয়া**—সুচারুরূপে প্রাপ্ত।

অনুবাদ

অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

বাসুদেব বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই পরমতত্ত্বকে জানা যায়, কেন না তিনিই হচ্ছেন পূর্ণ পরম-তত্ত্ব। ব্রহ্ম হচ্ছে তাঁর দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা, এবং পরমাত্মা হচ্ছে তাঁর আংশিক প্রকাশ। তাই ব্রহ্ম-উপলব্ধি অথবা পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে পরম-তত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি। চার শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত। কর্মীরা হচ্ছে জড়বাদী, কিন্তু অন্য তিনটি শ্রেণীর মানুষেরা অধ্যাত্মবাদী। সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। দ্বিতীয় স্তরের অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ পরমাত্মাকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করেছেন, আর তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাত্ম বাদী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সেই পরমপুরুষের চিন্ময় রশ্মিচ্ছটা দর্শন করেছেন। ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির মাধ্যমেই কেবল জানা যায়। আমরা ইতিপূর্বেই জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে কিভাবে ভক্তিযোগ অবলম্বন করা যায়, এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। যেহেতু ব্রহ্ম-উপলব্ধি এবং পরমাত্মা-উপলব্ধির পন্থা দুটি অর্থাৎ জ্ঞান এবং যোগ—পরম-তত্ত্ব উপলব্ধির অপূর্ণ পন্থা। ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জড় বিষয়াসক্তি রহিত বৈরাগ্যযুক্ত, এবং তদুপরি তা বেদান্ত-শ্রুতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই পূর্ণাঙ্গ পন্থাটির মাধ্যমেই কেবল ঐকান্তিকভাবে অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা পরম-তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন অধ্যাত্মবাদীদের জন্য নয়। তিন রকমের ভক্ত রয়েছেন, যথা—উত্তম অধিকারী ভক্ত, মধ্যম অধিকারী ভক্ত এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত হচ্ছে তারা, যাদের যথার্থ জ্ঞান নেই এবং যারা জড় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত নয়; কিন্তু তারা মন্দিরে ভগবানের পূজার প্রতি আকৃষ্ট। তাদের বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত। প্রাকৃত ভক্তরা পারমার্থিক উন্নতির থেকে জড় বিষয় লাভের প্রতি বেশি আসক্ত। তাই এই প্রাকৃত ভক্তের স্তর থেকে মধ্যম অধিকারী ভক্তের স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য ভক্তকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। মধ্যম অধিকারী ভক্তির স্তরে ভক্ত ভক্তিমার্গের চারটি তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন। যথা পরমেশ্বর ভগবান, ভগবানের ভক্ত, ভগবান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানুষ এবং ভগবদ্বিদ্বেষী। পরম তত্ত্বকে জানবার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য ভক্তকে অন্তত মধ্যম অধিকারীর ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হবে।

সেই জন্য কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে ভাগবতের প্রামাণিক সূত্র থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। প্রথম শ্রেণীর ভাগবত হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং অন্য ভাগবতটি হচ্ছে ভগবানের বাণী। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে তাই ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে জানবার জন্য ব্যক্তি-ভাগবতের শরণাগত হতে হয়। এই ধরনের ব্যক্তি-ভাগবত *শ্রীমদ্ভাগবতের* পেশাদারি পাঠক নয়, যারা তাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য ভাগবত পাঠ করে অর্থ উপার্জন করে। যথার্থ ব্যক্তি-ভাগবত হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীল সূত গোস্বামীর মতো শুকদেব গোস্বামীর প্রতিনিধি, এবং যিনি অবশ্যই জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কনিষ্ঠ ভক্তের ভগবানের কথা শ্রবণে কোন রুচি নেই বললেই চলে। এই ধরনের কনিষ্ঠ ভক্ত পেশাদারি ভাগবত পাঠকের কাছে পাঠ শোনার অভিনয় করে। কিন্তু তাদের এই পাঠ শোনা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের কলুষযুক্ত শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে সর্বনাশ হয়, তাই এই ভ্রান্তি সম্বন্ধে সকলকে খুব সতর্ক হতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র বাণী *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত হয়েছে। এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে অপ্রাকৃত বিষয়, কিন্তু তা হলেও তা পেশাদারি মানুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত নয়, কেন না সর্পের জিহ্বার স্পর্শে দুধ যেমন বিষে পরিণত হয়, ঠিক তেমনই এই পেশাদারি পাঠকদের মুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শুনলে তার ফলও বিষবৎ হয়।

তাই ঐকান্তিক ভক্তকে তাঁর পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের জন্য উপনিষদ, বেদান্ত এবং পূর্বতন আচার্য অথবা গোস্বামীদের প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী শ্রবণ না করলে যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারে না। শ্রবণ এবং অনুশীলন না করে কেবল লোক দেখানো ভক্তি আচরণ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তির পথে এক রকমের উৎপাতের সৃষ্টি হয়। তাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ অথবা পঞ্চরাত্র আদি শাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত বিধি বিহীন লোকদেখানো ভক্তি তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে হবে। অনধিকারী মানুষকে কখনও শুদ্ধ ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মারূপে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়। তাকে বলা হয় সমাধি।

শ্লোক ১৩

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ ১৩ ॥

অতঃ—অতএব; **পুম্ভিঃ**—মানুষের দ্বারা; **দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠ (দ্বিজ) ব্রাহ্মণগণ; **বর্ণাশ্রম**—বর্ণাশ্রম ধর্ম; **বিভাগশঃ**—বিভাগের দ্বারা; **স্বনুষ্ঠিতস্য**—

স্বধর্মের; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **সংসিদ্ধিঃ**—চরম সিদ্ধি, **হরি**—পরমেশ্বর ভগবান; **তোষণম্**—সন্তুষ্টি-বিধান।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধান করাই হচ্ছে স্ব-ধর্মের চরম ফল।

তাৎপর্য

সারা পৃথিবীর মানব সমাজ চারটি বর্ণ এবং জীবনের চারটি আশ্রমে বিভক্ত। চারটি বর্ণ হচ্ছে—বুদ্ধিমান শ্রেণী, সৈনিক, ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক। এই শ্রেণী বিভাগগুলি গুণ এবং কর্ম অনুসারে হয়ে থাকে, জন্ম অনুসারে নয়। তারপর জীবনেরও আবার চারটি স্তর রয়েছে, যথা—জ্ঞান আহরণের স্তর, গার্হস্থ্য জীবনের স্তর, অবসর-প্রাপ্ত জীবন এবং ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্বক পারমার্থিক জীবন। মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ হিত-সাধনের জন্য জীবনের এই বিভাগগুলি অপরিহার্য, তা না হলে কোন সমাজ-ব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানই পূর্বোল্লিখিত বিভাগগুলির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। মানব সমাজের এই বৃত্তি-বিভাগকে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম, যা হচ্ছে সভ্য জীবন যাপনের স্বাভাবিক পন্থা। বর্ণাশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্বকে জানা। এক শ্রেণীর লোকদের অপর শ্রেণীর লোকদের ওপর কৃত্রিমভাবে আধিপত্য করার জন্য এই বর্ণাশ্রম ধর্ম নয়। অত্যধিক ইন্দ্রিয়-প্রীতির ফলে যখন জীবনের চরম উদ্দেশ্য অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে জানার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তখন স্বার্থপর মানুষেরা এই বর্ণাশ্রম পন্থাকে নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের উপর আধিপত্য করার জন্য অসৎভাবে ব্যবহার করে। কলিযুগে এই কৃত্রিম আধিপত্যের প্রভাব চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিচক্ষণ মানুষেরা ভালভাবেই জানেন যে, এই বর্ণ এবং আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞানের উন্নত চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করা। এর মাধ্যমে সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়; এ ছাড়া এই বর্ণাশ্রম প্রথার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য অথবা বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম ফল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করা। সে কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৪/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১৪

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব ; **একেন**—একাগ্র **মনসা**—চিত্তে ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান্ ; **সাত্বতাম্**—ভক্তদের ; **পতিঃ**—রক্ষক ; **শ্রোতব্যঃ**—শ্রবণীয় ; **কীর্তিতব্যঃ**—কীর্তনীয় ; **চ**—এবং ; **ধ্যেয়ঃ**—স্মরণীয় ; **পূজ্যঃ**—পূজনীয় ; **চ**—এবং ; **নিত্যদা**—সর্বক্ষণ।

অনুবাদ

তাই একাগ্র চিত্তে, নিরন্তর ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং তাঁর আরাধনা করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

পরম-তত্ত্বকে জানা যদি জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তা অবশ্যই সর্বতোভাবে সম্পাদন করতে হবে। পূর্বোক্ত বর্ণ এবং আশ্রমের প্রতিটি স্তরেই এই চারটি পন্থা, অথাৎ ভগবানের মহিমা কীর্তন, ভগবানের মহিমা শ্রবণ, ভগবানের লীলা স্মরণ এবং ভগবানের আরাধনা—এ সবই হচ্ছে সাধারণ বৃত্তি। জীবনের এই উদ্দেশ্য রহিত হয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। এই চারটি কার্য নিয়েই মানুষের জীবন, বিশেষ করে আধুনিক সমাজের সমস্ত কার্যকলাপই শ্রবণ এবং কীর্তন কেন্দ্রিক। সমাজের যে-কোনও স্তরের যে-কোনও মানুষের সম্বন্ধে যখন যথার্থভাবে অথবা ভ্রান্তভাবে সংবাদপত্রে প্রশংসা করে অনেক কিছু লেখা হয়, তখন সে অচিরেই সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কখনও কখনও কোন বিশেষ দলের রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রচার হতে দেখা যায়, এবং এই ধরনের প্রচারের ফলে একজন নগণ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তবে এই ধরনের প্রচার হচ্ছে অযোগ্য মানুষের অপকীর্তির প্রচার, এবং তার ফলে কারোরই কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। এই ধরনের প্রচারের ফলে সাময়িক প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও তার কোন স্থায়ী ফল নেই। তাই এই ধরনের কার্যকলাপগুলি সময়ের অপচয় মাত্র। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমাই কেবল কীর্তন করা উচিত, যিনি হচ্ছেন আমাদের সম্মুখে দৃশ্যমান সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথমেই *জন্মাদ্যস্য* শ্লোকে আমরা বিশদভাবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। অপরের মহিমা কীর্তন করা অথবা অপরের কথা শ্রবণ করার যে প্রবৃত্তি আমাদের রয়েছে, তা যথার্থভাবে ভগবানের মহিমা-কীর্তনে নিয়োগ করতে হবে, এবং তার ফলেই যথার্থ শান্তি এবং আনন্দ লাভ হবে।

শ্লোক ১৫

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্যাৎকথারতিম্ ॥ ১৫ ॥

যৎ—যা, **অনুধ্যা**—অনুস্মরণ; **অসিনা**—তরবারির দ্বারা; **যুক্তাঃ**—যুক্ত হয়ে, **কর্ম**—কর্ম; **গ্রন্থি**—গ্রন্থি; **নিবন্ধনম্**—বন্ধনকারী; **ছিন্দন্তি**—ছেদন করে, **কোবিদাঃ**—বিবেকী; **তস্য**—তাঁর; **কঃ**—কে; **ন**—না; **কুর্যাৎ**—করবে; **কথা**—কথা; **রতিম্**—রতি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অনুস্মরণ রূপ তরবারির দ্বারা যথার্থ জ্ঞানী পুরুষেরা কর্ম-বন্ধন ছেদন করেন। তাই সেই ভগবানের কথায় কেই বা রতিযুক্ত হবে না?

তাৎপর্য

চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ যখন জড় পদার্থের সংস্পর্শে আসে তখন একটি গ্রন্থির সৃষ্টি হয়, যা কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তিকামী মানুষদের অবশ্যই ছেদন করতে হয়। 'মুক্তি' কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ স্মরণ করেন, তাঁদের আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয়ে যায়। কেন না পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপই (লীলা) জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। সেগুলি হচ্ছে সর্বাকর্ষক চিন্ময় কার্যকলাপ, এবং তাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপে নিরন্তর মগ্ন থাকলে, বদ্ধ জীব ধীরে ধীরে চিন্ময়ত্ব লাভ করেন এবং অবশেষে জড়বন্ধন ছেদন করেন।

তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ভগবদ্ভক্তির একটি আনুষঙ্গিক ফল। চিন্ময় জ্ঞান মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই জ্ঞান অবশ্যই ভক্তিযুক্ত সেবা সমন্বিত হতে হবে, যাতে অবশেষে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্যই কেবল বর্তমান থাকে। তখনই মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। এমন কি সকাম কর্মীদের কর্মও ভক্তিযুক্ত সেবা-মিশ্রিত হলেই তবে মুক্তিদান করে। ভগবদ্ভক্তি-মিশ্রিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ। তেমনই, মনোধর্মী জ্ঞান যখন ভক্তিযুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। তবে শুদ্ধ-ভক্তি জ্ঞান এবং কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত, কেন না তা কেবল জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকেই মুক্ত করে না, তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তিও প্রদান করে থাকে।

তাই, বিচক্ষণ জ্ঞানী মানুষেরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করেন। অপ্রতিহতভাবে এবং অহৈতুকীভাবে তাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের আদর্শ পন্থা। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থা প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই নিয়ম পালন করেছিলেন, এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁরা বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন আশ্রমের মানুষদের জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবন করে গেছেন।

শ্লোক ১৬

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ ১৬ ॥

শুশ্রূষোঃ—ভগবৎ-কথা শ্রবণাভিলাষী; **শ্রদ্দধানস্য**—মনোযোগ এবং সাবধানতা সহকারে; **বাসুদেব**—বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয়; **কথা**—কথা; **রুচিঃ**—আসক্তি; **স্যাৎ**—সম্ভব হয়; **মহৎ-সেবয়া**—ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার ফলে; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **পুণ্য-তীর্থ**—যাঁরা সব রকম পাপ থেকে মুক্ত; **নিষেবণাৎ**—সেবা করার মাধ্যমে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ, সব রকমের পাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভগবদ্ভক্তদের সেবা করার ফলে মহৎ-সেবা সাধিত হয়। এই ধরনের সেবার ফলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে আসক্তির উদয় হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলেই জীব বদ্ধ-দশায় পতিত হয়। কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের বলা হয় দেব এবং কিছু মানুষ আছে, যাদের বলা হয় অসুর। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় দেব, আর যারা পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁদের বলা হয় অসুর। *ভগবদ্গীতায়* ষোড়শ অধ্যায়ে অসুরদের সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অসুরেরা জন্ম-জন্মান্তরে নিম্ন থেকে নিম্নতর জীবন প্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয়—তারা অত্যন্ত অধঃপতিত পশু-শরীর লাভ করে এবং পরম-তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় এই সমস্ত অসুরেরা বিভিন্ন স্থানে নিত্য-মুক্ত ভগবদ্ভক্তের কৃপার প্রভাবে কলুষমুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করে। ভগবানের এই ধরনের ভক্তরা, যাঁরা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আসুরিক ভাবাপন্ন বদ্ধ-জীবদের উদ্ধার করেন, তাঁরা ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ, এবং তাঁরা যখন নাস্তিকতার ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে আসেন, তখন বুঝতে হয় তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। তাঁরা ভগবানের পুত্রের মতো, ভৃত্যের মতো অথবা তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদের মতো, কিন্তু তাঁরা কেউই নিজেদের ভগবান বলে দাবি করেন না। এই রকমের অসৎ দাবি কেবল অসুরেরাই করে থাকে এবং এই সমস্ত অসুরদের আসুরিক অনুগামীরাও এই সমস্ত ভণ্ডদের ভগবান অথবা ভগবানের অবতার বলে গ্রহণ করে। বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের অবতার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সমস্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত কখনই কাউকে ভগবান অথবা ভগবানের অবতার বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়।

যে সমস্ত ভক্ত প্রকৃতই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁরা ভগবানের সেবকদের ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করেন। ভগবানের এই ধরনের সেবকদের বলা হয় মহাত্মা অথবা তীর্থ; তাঁরা স্থান এবং কাল অনুসারে ভগবানের বাণী প্রচার করেন। ভগবানের সেবকেরা মানুষকে ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। কেউ যখন তাদের ভগবান বলে সম্বোধন করে, তখন তাঁরা কখনই সেটা বরদাস্ত করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান এবং বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তবুও তিনি ভগবানের ভক্তরূপে লীলাবিলাস করেছিলেন। যাঁরা জানতেন যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাঁরা তাঁকে ভগবান বলে সম্বোধন করতেন, কিন্তু তিনি তখন হাত দিয়ে কান দুটি ঢেকে বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করতেন। এইভাবে, তিনি ভগবান বলে সম্বোধিত হলে প্রতিবাদ করতেন—যদিও নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। ভগবান নিজেই এইভাবে আচরণ করে কপটচারী যে সমস্ত ভণ্ড নিজেদের ভগবান বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন।

ভগবানের সেবকেরা ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য আসেন এবং বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে তাঁদের সাহায্য করা। সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার থেকে ভগবানের সেবকের সেবা করার মাধ্যমে ভগবানকে অধিক সন্তুষ্ট করা যায়। ভগবান যখন দেখেন যে তাঁর সেবকদের যথাযথভাবে শ্রদ্ধা করা হচ্ছে তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হন। কেন না এই ধরনের সেবকেরা ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য সব রকমের বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকেন এবং তাই তাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৯) ভগবান ঘোষণা করেছেন, যাঁরা তাঁর মহিমা প্রচার করার জন্য সব রকমের বিপদকে তুচ্ছ করেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন তাঁর সব চাইতে প্রিয়। কেউ যখন ভগবানের সেবকদের সেবা করেন, তখন তাঁর মধ্যে ভগবানের সেবকদের গুণগুলি প্রকাশিত হয়, এবং তার ফলে তিনি ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। ভগবানের কথা শ্রবণ করার ঐকান্তিক আগ্রহ হচ্ছে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার সর্বপ্রথম যোগ্যতা।

শ্লোক ১৭

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥ ১৭ ॥

শৃণ্বতাম—ভগবানের কথা শ্রবণে আগ্রহশীল; **স্ব-কথাঃ**—তাঁর স্বীয় কথা; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পুণ্য**—পুণ্য; **শ্রবণ**—শ্রবণ; **কীর্তনঃ**—কীর্তন;

হৃদি অন্তঃস্থঃ—হৃদয়াভ্যন্তরে; **হি**—অবশ্যই; **অভদ্রাণি**—জড় জগতকে ভোগ করার বাসনা; **বিধুনোতি**—নাশ করে; **সু-হৃৎ**—হিতকারী; **সতাম্**—সাধুদের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনা বিনাশ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই যখন নিরপরাধে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, তখন বুঝতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত নামরূপে সেখানে বর্তমান, এবং সেই নাম ভগবানেরই মতো পূর্ণ শক্তিমান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর '*শিক্ষাষ্টকে*' স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন যে, ভগবান তাঁর দিব্য নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। সেই নাম উচ্চারণ করার জন্য কোন স্থান, কাল বা পাত্রের বাধ্য-বাধকতা নেই এবং যে কেউ তার সুবিধা অনুসারে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে সেই নাম কীর্তন করতে পারেন। ভগবান আমাদের প্রতি এতই কৃপালু যে, তাঁর অপ্রাকৃত নাম-রূপে তিনি স্বয়ং আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগা যে ভগবানের নাম এবং মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে আমাদের কোন রুচি নেই। ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে কীভাবে রুচি লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। তা সম্ভব হয় কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে।

ভগবান তাঁর ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। তিনি যখন দেখেন যে কোন ভক্ত তাঁর অপ্রাকৃত সেবা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং তার ফলে তাঁর কথা শ্রবণে গভীরভাবে উৎসুক হয়েছেন, তখন ভগবান তাঁর হৃদয় থেকে তাঁকে এমনভাবে পরিচালিত করেন, যাতে ভক্ত অনায়াসে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের যে বাসনা, তার থেকে আমাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের উৎকণ্ঠা অনেক বেশি। আমরা প্রায় কেউই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই না। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চান। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী হন, তখন ভগবান সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করেন।

সর্বতোভাবে পাপমুক্ত না হলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। জড় জগতের পাপগুলি আমাদের জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার বাসনা থেকে উদ্ভূত। এই ধরনের কামনা-বাসনা মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কামিনী এবং কাঞ্চন হচ্ছে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। ভক্তিমার্গে বহু বড়

বড় ভক্ত এই প্রলোভনের বলি হয়ে ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হয়েছেন। কিন্তু ভগবান নিজে যখন কাউকে সাহায্য করেন, তখন ভগবানের কৃপায় তা অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়।

কামিনী এবং কাঞ্চনের দ্বারা বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেন না জীব অনাদিকাল ধরে তাদের সঙ্গ করে আসছে, তাই তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে কিছু সময় তো লাগবেই। কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠাভরে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তখন ধীরে ধীরে তিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভক্ত তখন সেই সমস্ত আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি লাভ করেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁর মন থেকে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সব কটি প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়।

শ্লোক ১৮

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ১৮ ॥

নষ্ট—বিনাশ প্রাপ্ত হয়; **প্রায়েষু**—প্রায় সম্পূর্ণরূপে; **অভদ্রেষু**—যা কিছু অমঙ্গলজনক; **নিত্যম্**—নিয়ত; **ভাগবত**—শ্রীমদ্ভাগবত, অথবা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **উত্তম**—উৎকৃষ্ট; **শ্লোকে**—বন্দনা; **ভক্তিঃ**—প্রেমময়ী সেবা; **ভবতি**—হয়; **নৈষ্ঠিকী**—সুদৃঢ়।

অনুবাদ

নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাৎপর্য

আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হৃদয়ের সমস্ত অশুভ প্রবৃত্তিগুলি নির্মল করার উপায় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপায়টি হচ্ছে ভাগবতের সঙ্গ করা। দু'রকমের ভাগবত রয়েছেন; যথা—গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবত। এই উভয় ভাগবতই হচ্ছেন ভবরোগ নিরাময়ের উপযুক্ত উপায়, এবং তাতে উভয়ের অথবা একজনের শরণাগত হলেই সব রকমের প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থ-ভাগবতের মতোই মঙ্গলপ্রদ, কেননা ভক্ত-ভাগবত গ্রন্থ-ভাগবতের নির্দেশ অনুসারেই তাঁর জীবনকে পরিচালনা করেন এবং গ্রন্থ-ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত বা ভাগবতদের তথ্যে পূর্ণ। গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবতে অভেদ সম্বন্ধ রয়েছে।

ভক্ত-ভাগবত হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। তাই ভক্ত-ভাগবতের সন্তুষ্টি-বিধানের ফলেই গ্রন্থ-ভাগবতের কৃপা লাভ হয়। ভক্ত-ভাগবত অথবা গ্রন্থ-ভাগবতের সেবা করার ফলে যে কিভাবে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি লাভ করা যায়, তা যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য, এবং শ্রীল নারদ মুনি, যিনি তাঁর পূর্ব জীবনে ছিলেন একজন দাসীর পুত্র, তা বিশ্লেষণ করেছেন। নারদ মুনির পূর্ব জীবনে তাঁর মাতা ছিলেন একজন দাসী এবং তিনি কয়েকজন ঋষির সেবায় যুক্ত ছিলেন, এবং তাঁর ফলে নারদ মুনিও সেই ঋষিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে এবং তাঁদের উচ্ছিষ্ট আহার করার ফলে, দাসী-পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরবর্তী জীবনে ভগবৎ-পার্ষদ মহাভক্ত শ্রীল নারদ মুনিতে পরিণত হন। এমনই হচ্ছে ভাগবত-সঙ্গের অলৌকিক প্রভাব। এই প্রভাব সম্বন্ধে ব্যবহারিকভাবে অবগত হতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভাগবত-সঙ্গ করার ফলে অনায়াসে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, এবং যার ফলে জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত হন। ভাগবতের তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির পথে যতই উন্নতি লাভ হয়, ভক্ত ততই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। তাই গ্রন্থ-ভাগবতের বাণী ভক্ত-ভাগবতের কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হয়, এবং এই দুই ভাগবতের সমন্বয়ের ফলে নবীন ভক্ত প্রভূতভাবে লাভবান হয়ে ভক্তিমার্গে ক্রমোন্নতি লাভ করেন।

শ্লোক ১৯

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥

তদা—সেই সময়ে; **রজঃ**—রজোগুণে; **তমঃ**—তমোগুণে; **ভাবাঃ**—স্থিতি; **কাম**—কাম এবং বাসনা; **লোভ**—লোভ; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **চ**—এবং; **যে**—যা কিছু; **চেতঃ**—মন; **এতৈঃ**—এগুলির দ্বারা; **অনাবিদ্ধম্**—প্রভাবিত না হয়ে; **স্থিতম্**—স্থিত হয়ে; **সত্ত্বে**—সত্ত্বগুণে; **প্রসীদতি**—এইভাবে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

যখন হৃদয়ে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়, তখন রজ ও তমোগুণের প্রভাবজাত কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

জীব যখন তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে প্রসন্ন হয়। সেই অবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত বা আত্মানন্দী অবস্থা। এই আত্মতৃপ্ত

অবস্থা নিষ্ক্রিয় মূর্খের আত্মতৃপ্তির মতো নয়। নিষ্ক্রিয় মূর্খ অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন, কিন্তু আত্মতৃপ্ত আত্মানন্দী জড়াতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিযুক্ত হওয়া মাত্রই এই স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তি নিষ্ক্রিয়তা নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে আত্মার স্বাভাবিক সক্রিয়তা।

জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন আত্মার বৃত্তি কলুষিত হয়ে যায়; এবং সেই কলুষিত বা বিকৃত বৃত্তির প্রকাশ হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, নিষ্ক্রিয়তা, অজ্ঞান এবং নিদ্রা। রজ এবং তমোগুণের এই সমস্ত প্রভাবগুলির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির প্রকাশের ফল। ভক্ত তৎক্ষণাৎ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন, এবং তারপর আরও ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে তিনি শুদ্ধসত্ত্ব বা বাসুদেব স্তরে অধিষ্ঠিত হন। এই শুদ্ধ-সত্ত্ব স্তরেই কেবল ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম লাভ করে তাঁকে চাক্ষুষ দর্শন করা যায়।

ভক্ত সর্বদাই বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত, তাই তিনি কখনও কারও কোন রকম অনিষ্ট করেন না। কিন্তু অভক্ত, তা সে যত শিক্ষিতই হোক না কেন,সর্বদাই অপরের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। ভক্ত মূর্খ বা আবেগপ্রবণ নয়। অপরের অনিষ্টকারী মূর্খ বা আবেগপ্রবণ মানুষেরা বাহ্যিকভাবে যতই ভগবানের ভক্ত হওয়ার অভিনয় করুক না কেন, তারা কখনই ভগবানের ভক্ত হতে পারে না। ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সৎ গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত। আয়তনগতভাবে এই গুণগুলির তারতম্য রয়েছে, কিন্তু গুণগতভাবে ভক্ত এবং ভগবান এক এবং অভিন্ন।

শ্লোক ২০

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥ ২০ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রসন্ন**—প্রসন্ন; **মনসঃ**—মনের; **ভগবদ্ভক্তি**—শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা; **যোগতঃ**—প্রভাবে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **তত্ত্ব**—জ্ঞান; **বিজ্ঞানম্**—বিজ্ঞান; **মুক্ত**—মুক্ত; **সঙ্গস্য**—সঙ্গের; **জায়তে**—কার্যকরী হয়।

অনুবাদ

এইভাবে শুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে যাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে, তিনি সব রকম জড়-বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৩) বলা হয়েছে যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল দু'একজন সৌভাগ্যবান মানুষই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াসী হন। অধিকাংশ মানুষই

রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত এবং তাই তারা সর্বদাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অজ্ঞান এবং নিদ্রায় মগ্ন। এই রকম বহু নররূপী পশুর মধ্যে কদাচিৎ একজন মানুষ মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে তার সেই কর্তব্য সম্পাদনে প্রয়াসী হয়। আর এই রকম হাজার হাজার সিদ্ধিকামী মানুষের মধ্যে কেবল দু'একজন মাত্র তত্ত্বগতভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। *ভগবদ্গীতাতে* (১৮/৫৫) আরও বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার যে বিজ্ঞান তা কেবল ভক্তিযোগের মাধ্যমেই জানা যায়।

সেই কথাই এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। কোন সাধারণ মানুষ, অথবা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করেছেন যে মানুষ, তিনিও পরমেশ্বর ভগবানকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অথবা পূর্ণরূপে জানতে পারেন না। মানব জীবনের উদ্দেশ্য তখনই সিদ্ধ হয়, যখন মানুষ বুঝতে পারে যে সে জড় পদার্থ নয়, তার স্বরূপে সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। যখন কেউ সে কথা জানতে পারে, তখন আর জড় জগতের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না, সে তৎক্ষণাৎ জড় কামনা-বাসনাগুলি পরিত্যাগ করে। তার চিন্ময় স্বরূপে, সে তখনই যথার্থ প্রসন্নতা অনুভব করে। মানুষ যখন রজ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখনই কেবল এই উপলব্ধি সম্ভব হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে কেউ যখন যথার্থ ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জন করে, তখনই কেবল তা সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন সত্ত্বগুণের প্রতীক; আর অন্যরা, যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত নয়, তারা হয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা শূদ্রাধম। মানব জীবনে ব্রাহ্মণের স্তরই হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর, কেন না তাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। তাই গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ না হওয়া পর্যন্ত ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্ত তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তবে সেটিই সর্বোচ্চ স্তর নয়। পূর্বে যা বলা হয়েছে, সেই ধরনের ব্রাহ্মণকে গুণাতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে বৈষ্ণব হতে হবে। শুদ্ধ বৈষ্ণব হচ্ছেন মুক্ত জীব এবং তিনি ব্রাহ্মণ স্তরেরও ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত। জড় জগতে ব্রাহ্মণও বদ্ধ জীব, কেননা ব্রাহ্মণ যদিও ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং তিনি জড় জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কিন্তু তবুও পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান তাঁর জানা হয়নি। ব্রাহ্মণ-স্তর অতিক্রম করে বাসুদেব-স্তরে অধিষ্ঠিত হলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়। পরমেশ্বর ভগবানকে জানার যে বিজ্ঞান, তা হচ্ছে পারমার্থিক মার্গে স্নাতকোত্তর বিষয়। মূর্খ লোকেরা অথবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, এবং তারা খেয়াল-খুশিমত কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে। কেউ যদি ব্রাহ্মণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও জড় জগতের গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারে, তা হলে তার পক্ষে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। কোন যথার্থ ব্রাহ্মণ যখন বৈষ্ণবে পরিণত হন, তখন তিনি জড় জগতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং সেই আত্মতৃপ্ত অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানতে পারেন।

শ্লোক ২১

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ২১ ॥

ভিদ্যতে—ভেদ করে; **হৃদয়**—হৃদয়; **গ্রন্থিঃ**—গ্রন্থি; **ছিদ্যন্তে**—ছেদন করে; **সর্ব**—সমস্ত; **সংশয়াঃ**—সংশয়; **ক্ষীয়ন্তে**—বিনাশ করে; **চ**—এবং; **অস্য**—তাঁর; **কর্মাণি**—সকাম কর্মজ্ঞান; **দৃষ্ট**—দর্শন করে; **এব**—অবশ্যই; **আত্মনি**—আত্মায়; **ঈশ্বরে**—ঈশ্বরকে।

অনুবাদ

আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানকে দর্শন হলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভ হলে সেই সঙ্গে আত্মাকেও দর্শন হয়। চিন্ময় আত্মারূপে জীবের পরিচিতি সম্বন্ধে অনেক কল্পনা এবং সন্দেহ রয়েছে। জড়বাদীরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, আর জ্ঞানীরা মনে করে যে, নির্বিশেষ, নিরাকার, অদ্বয় ব্রহ্ম থেকে আত্মা অভিন্ন—তারা আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে না। কিন্তু যাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা, তাঁরা বলেন যে আত্মা এবং পরমাত্মা দুটি ভিন্ন সত্তা; তাঁরা গুণগতভাবে এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে ভিন্ন। এ ছাড়া অন্য বহু মতবাদ রয়েছে, কিন্তু ভক্তিযোগের মাধ্যমে যখনই কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধ হয়, তৎক্ষণাৎ সমস্ত কল্পনাপ্রসূত মতবাদ বিদূরিত হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো, আর পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে জড়বাদীদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনা মধ্যরাত্রির অন্ধকারের মতো। হৃদয়াকাশে যখনই কৃষ্ণ-সূর্যের উদয় হয়, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জড়বাদীদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার থাকতে পারে না, তেমনই অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে যে সমস্ত আপেক্ষিক সত্য, তা পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

ভগবদ্গীতায় (১০/১১) ভগবান বলেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তিনি তাঁদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে তাঁদের হৃদয়ের সংশয়রূপী সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করেন। তাই যেহেতু তিনি নিজেই তাঁর ভক্তদের হৃদয়কে আলোকিত করেন, তাই তাঁর সেবাপরায়ণ ভক্তের অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি পরম সত্য এবং আপেক্ষিক সত্য সম্বন্ধে সব কিছু অবগত হন। ভক্ত কখনই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকতে পারেন না, এবং যেহেতু ভগবান নিজে তাঁকে জ্ঞান দান করেন, তাই তাঁর জ্ঞান অবশ্যই পূর্ণ। কিন্তু যারা তাদের সীমিত জ্ঞানের মাধ্যমে অসীম এবং অনন্ত

পরমতত্ত্বকে জানবার জন্য জল্পনা কল্পনা করে, তারা কোন দিনই তাঁকে জানতে পারে না; যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় পরম্পরা; অর্থাৎ যে জ্ঞান শ্রদ্ধা-সমন্বিত শরণাগতির মাধ্যমে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অবরোহ পন্থায় লাভ হয়। পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করে তাঁকে কখনও জানা যায় না। এই ধরনের অবিশ্বাসীদের কাছে তিনি কখনও নিজেকে প্রকাশ করেন না। একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন আগুন থেকে বেরিয়ে এলেই তার দহনশক্তি হারিয়ে ভস্মে পরিণত হয়, ঠিক তেমনই অণুসদৃশ জীব পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই মায়ার কবলিত হয়। ভক্তরা বিনীত, এবং তাই দিব্য জ্ঞান অবরোহ পন্থায় তাঁদের কাছে নেমে আসে। এই পন্থায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই জ্ঞান দান করেন ব্রহ্মাকে, তারপর ব্রহ্মা তাঁর পুত্র এবং শিষ্যদের সেই জ্ঞান দান করেন। এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়। পরমাত্মারূপে ভক্তের হৃদয়ে থেকে ভগবান তাঁকে এই জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করেন। এইটিই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের যথার্থ পন্থা।

এই জ্ঞানের প্রভাবে ভক্ত চেতন আত্মা এবং জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ হন। কেন না যে গ্রন্থির দ্বারা চেতন আত্মা এবং জড় পদার্থ আবদ্ধ ছিল, ভগবান স্বয়ং তা ছেদন করেন। এই গ্রন্থিটিকে বলা হয় অহঙ্কার, এবং তার ফলে জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে জড় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। যখন এই গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখন সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। তখন জীব তার প্রভুকে দর্শন করতে পারে এবং সর্বতোভাবে তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়; তখন তার সমস্ত কর্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়। জড় জগতে জীব নিজেকে তার কর্মের ভোক্তা বলে মনে করে জন্ম-জন্মান্তরে তার পাপ এবং পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ সে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তখন তার কর্ম আর কোনও ফল প্রসব করে না।

শ্লোক ২২

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ২২ ॥

অতঃ—অতএব; **বৈ**—অবশ্যই; **কবয়ঃ**—সমস্ত পরমার্থবাদীরা; **নিত্যম্**—সর্বক্ষণ; **ভক্তিম্**—ভগবানের সেবা; **পরময়া**—পরম; **মুদা**—গভীর আনন্দ সহকারে; **বাসুদেবে**—শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **কুর্বন্তি**—করেন; **আত্ম**—স্বীয়; **প্রসাদনীম্**—যা অনুপ্রাণিত করে।

অনুবাদ

তাই সমস্ত পরমার্থবাদীরা চিরকাল গভীর আনন্দ সহকারে পরমেশ্বর ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে আসছেন, কেন না এই ধরনের প্রেমময়ী সেবা আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবার বৈশিষ্ট্য এখানে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর ভগবান, এবং বলদেব, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও নারায়ণ থেকে শুরু করে পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার এবং পরমেশ্বর ভগবানের অন্যান্য অনন্ত কোটি প্রকাশ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং কলা। জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের আদি রূপ, এবং চিন্ময় স্তরে তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস। তাই যে সমস্ত উন্নত স্তরের পরমার্থবাদী ভগবানের নিত্য লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণে আগ্রহী, তাঁদের কাছে তিনিই হচ্ছেন সবচাইতে বেশি আকর্ষণীয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব ভিন্ন ভগবানের অন্যান্য রূপে বৃন্দাবনের মতো অপ্রাকৃত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার অন্য কোনও সুযোগ নেই। কিছু মূর্খ লোক তর্ক করে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস ইদানীং স্বীকৃতি লাভ করেছে; কিন্তু তাদের সে যুক্তি সত্য নয়, কেন না শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য এবং ব্রহ্মার প্রতিদিনে একবার তিনি অবতীর্ণ হন, ঠিক যেমন প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা অন্তর সূর্য একবার করে পূর্ব-দিগন্তে উদিত হয়।

শ্লোক ২৩

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥ ২৩ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রকৃতেঃ**—জড়া-প্রকৃতির; **গুণাঃ**—গুণত্রয়; **তৈঃ**—তাহাদের দ্বারা; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **পরঃ**—দিব্য; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **একঃ**—এক; **ইহাস্য**—এই জড় জগতের; **ধত্তে**—ধারণ করে; **স্থিতি-আদয়ে**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ ইত্যাদির জন্য; **হরি**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **বিরিঞ্চি**—ব্রহ্মা; **হর**—মহাদেব **ইতি**—এইরূপ; **সংজ্ঞাঃ**—বিভিন্ন রূপ; **শ্রেয়াংসি**—আত্যন্তিক লাভ; **তত্র**—তার মধ্যে, **খলু**—অবশ্যই; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তনোঃ**—রূপ; **নৃণাম্**—মানুষদের; **স্যুঃ**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সত্ত্ব, রজ এবং তম নামক জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গে

পরোক্ষভাবে যুক্ত। জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিনটি গুণজাত রূপ ধারণ করেন। এই তিনটি রূপের মধ্যে, সমস্ত মানুষই সত্ত্বগুণজাত রূপ বিষ্ণুর থেকে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভক্তি যে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অংশ প্রকাশদেরই উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়া উচিত, তা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সমস্ত অংশ-প্রকাশ হচ্ছেন বিষ্ণু-তত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় প্রকাশ হচ্ছেন বলদেব। বলদেব থেকে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ থেকে নারায়ণ, নারায়ণ থেকে দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ এবং এই সঙ্কর্ষণ থেকে পুরুষাবতার বিষ্ণু। বিষ্ণু অথবা এই জড় জগতের সত্ত্ব গুণাবতার হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপী পুরুষ অবতার বা পরমাত্মা। ব্রহ্মা হচ্ছেন রজোগুণের বিগ্রহ এবং শিব হচ্ছেন তমোগুণের বিগ্রহ। এই তিনজন হচ্ছেন জড় জগতের তিনটি গুণের ঈশ্বর। জড় জগতের সৃষ্টি হয় ব্রহ্মার দ্বারা রজোগুণের প্রভাবে। তার পালন হয় সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর দ্বারা এবং তারপর যখন তা বিনাশ করার প্রয়োজন হয়, তখন শিব তাঁর তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে তা সাধন করেন। জড়বাদীরা এবং মূর্খ মানুষেরা যথাক্রমে ব্রহ্মা এবং শিবের পূজা করে। কিন্তু প্রকৃত পরমার্থবাদীরা সত্ত্বগুণে বিষ্ণু এবং তাঁর বিভিন্ন রূপের আরাধনা করেন। বিষ্ণু তাঁর অনন্ত কোটি অংশ এবং কলায় প্রকাশিত হন। সেই পরমেশ্বরের পূর্ণ রূপ হচ্ছেন ভগবান এবং তাঁর বিভিন্ন অংশ হচ্ছে জীব। জীব এবং ভগবান উভয়েরই চিন্ময় স্বরূপ রয়েছে। জীব কখনও কখনও জড়া প্রকৃতির বশীভূত হয়ে পড়ে, কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্ব সর্বদাই মায়ার অধীশ্বর। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই জগতে আবির্ভূত হন জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য। এই ধরনের জীবেরা জড় জগতে আসে জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করবার সঙ্কল্প নিয়ে, এবং এইভাবে তারা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই এই জড় জগতরূপী কারাগারে বিভিন্ন রকমের দণ্ডভোগ করার জন্য জীবকে বিভিন্ন রকমের জড় শরীর ধারণ করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ব্রহ্মা এই জড় জগতরূপী কারাগার সৃষ্টি করেন এবং কল্পান্তে শিব এই সৃষ্টি ধ্বংস করেন। আর এই কারাগারের পালনকার্য সম্পাদন করেন বিষ্ণু, ঠিক যেমন রাজা তাঁর রাজ্যের কারাগারগুলি পালন করেন। তাই কেউ যদি জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিরূপী দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জড় জগতের কারাগার থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে কেবল ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই আরাধনা করা যায়, এবং কেউ যদি এই জড় জগতরূপী কারাগারে থাকতে চায়, তা হলে তারা সাময়িক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য ক্ষণস্থায়ী কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের পূজা করতে পারে। কোন দেবতাই কিন্তু

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন না। তা কেবল শ্রীবিষ্ণুই করতে পারেন। তাই চরম মঙ্গল কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই সাধিত হয়।

শ্লোক ২৪

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎসত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ২৪ ॥

পার্থিবাৎ—মাটি থেকে; **দারুণঃ**—কাঠ; **ধূমঃ**—ধূম; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **অগ্নিঃ**—আগুন; **ত্রয়ী**—বৈদিক যজ্ঞ; **ময়ঃ**—তৈরি হয়; **তমসঃ**—তমোগুণে; **তু**—কিন্তু; **রজঃ**—রজোগুণে; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণে; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম**—পরম তত্ত্ব; **দর্শনম্**—উপলব্ধি।

অনুবাদ

কাঠ হচ্ছে মৃত্তিকার বিকার, কিন্তু ধোঁয়া কাঠ থেকে শ্রেয়। আর অগ্নি তার থেকেও শ্রেয়, কেন না অগ্নির দ্বারা (বৈদিক যজ্ঞের মাধ্যমে) উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা যায়। তেমনই, রজোগুণ তমোগুণ অপেক্ষা শ্রেয়; কিন্তু সত্ত্বগুণ সর্বশ্রেষ্ঠ, কেন না সত্ত্বগুণের দ্বারা আমরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।

তাৎপর্য

পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এখন আরও বিস্তারিতভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য প্রথমে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে হবে। কিন্তু উন্নতির পথে যদি কোন বাধা আসে, তবে যে কেউ সদ্‌গুরুর সুদক্ষ পরিচালনায় এমন কি তমোগুণের স্তর থেকে সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে পারে। তাই ভগবদ্ভক্তি লাভে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী ব্যক্তিকে সে পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হবে; এবং সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর শিষ্যকে জীবনের যে কোনও স্তর থেকে—তা সে তমই হোক বা রজই হোক বা সত্ত্বই হোক, সুদক্ষভাবে পারমার্থিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।

তাই কেউ যদি মনে করে যে পরমেশ্বর ভগবানের যে কোনও রূপের পূজা করলে তার ফল একই হবে, তা হলে সে ভুল করবে। বিষ্ণু-তত্ত্ব ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রূপই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে প্রকাশিত, এবং তাই জড়া প্রকৃতিজাত রূপগুলি মানুষকে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে সাহায্য করতে পারে না; অথচ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অসভ্য জীবন অথবা নিম্নস্তরের পশুজীবন তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। বিভিন্ন রকমের জড় জাগতিক লাভের প্রত্যাশী যে সভ্য মানুষ, তার জীবন রজোগুণের দ্বারা

প্রভাবিত। রজোগুণের স্তরে দর্শন, শিল্পকলা, নীতিবোধ ইত্যাদির সূক্ষ্ম আবেগের মাধ্যমে পরম সত্যকে জানার স্বল্প আভাস দেখা যায়। কিন্তু সত্ত্বগুণ হচ্ছে তারও অনেক ঊর্ধ্বে জড়া প্রকৃতির গুণ, যা পরম সত্যকে জানার জন্য মানুষকে যথার্থভাবে সাহায্য করে। অর্থাৎ, বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন রকমের পূজা-পদ্ধতির মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের পূজার মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে এবং সেগুলির ফলও ভিন্ন।

শ্লোক ২৫

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ ॥ ২৫ ॥

ভেজিরে—সেবা করে; **মুনয়ঃ**—ঋষিরা; **অথ**—এইভাবে; **অগ্রে**—পূর্বে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অধোক্ষজম্**—ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **বিশুদ্ধম্**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত; **ক্ষেমায়**—আত্যন্তিক লাভের জন্য; **কল্পন্তে**—যোগ্যতা; **যে**—যারা; **অনু**—অনুসরণ; **তান্**—তারা; **ইহ**—এই জড় জগতে।

অনুবাদ

পূর্বে সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন, কেন না তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্যন্তিক মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর আরাধনা করেছিলেন। যাঁরা সেই সমস্ত মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক বিষয় লাভ এবং জড় চেতনের পার্থক্য নিরূপণকারী জ্ঞান লাভ ধর্ম আচরণের উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম আচরণের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান পরম পুরুষরূপে বিরাজ করছেন. সেখানে মুক্ত জীবন লাভ করা। তাই ধর্মীয় অনুশাসন হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া আইন, এবং মহাজন বা ভগবানের অনুমোদিত প্রতিনিধি ছাড়া আর কেউই ধর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নন। ভগবানের বিশেষ প্রতিনিধিস্বরূপ বারোজন মহাজন রয়েছেন, যাঁরা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত, এবং তাঁরা সকলেই ভক্তিভরে ভগবানের সেবা করেন। যে সমস্ত মানুষ যথার্থ মঙ্গল সাধনের অভিলাষী, তাঁরা এই মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরম মঙ্গল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২৬

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ২৬ ॥

মুমুক্ষবঃ—মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী; **ঘোর**—ভয়ঙ্কর; **রূপান্**—আকৃতি বিশিষ্ট; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ভূত-পতীন্**—দেবতা; **অথ**—অতএব; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; **কলাঃ**—অংশ; **শান্তাঃ**—আনন্দপূর্ণ; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **হি**—অবশ্যই; **অনসূয়বঃ**—অসূয়ারহিত।

অনুবাদ

যাঁরা মুক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা অবশ্যই অসূয়ারহিত এবং তাঁরা সকলের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ। তথাপি তাঁরা ভয়ঙ্কর আকৃতি বিশিষ্ট দেব-দেবীদের ত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর অংশ অবতারদের নিত্য আনন্দময় রূপের আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন সমস্ত বিষ্ণু-তত্ত্বের আদি পুরুষ, তিনি নিজেকে দুরকমভাবে বিস্তার করেন, যথা—পূর্ণাংশ এবং বিভিন্নাংশ। তাঁর বিভিন্ন অংশগুলি হচ্ছে তাঁর সেবক, আর তাঁর বিষ্ণুতত্ত্বের পূর্ণ অংশ হচ্ছে সেব্য।

সমস্ত দেবতারা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা শক্তিমান, তাঁরাও তাঁর বিভিন্নাংশ। তাঁরা বিষ্ণু-তত্ত্ব নন। সকল বিষ্ণু-তত্ত্বই পরম পুরুষ ভগবানের মত শক্তি-সম্পন্ন এবং তাঁরা বিভিন্ন স্থান, এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের বিভিন্ন শক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু ভগবানের বিভিন্নাংশ জীবেরা সীমিত শক্তিসম্পন্ন। তারা বিষ্ণু-তত্ত্বের মতো অনন্ত শক্তিসম্পন্ন নয়। তাই কখনই বিষ্ণুতত্ত্বদের জীবতত্ত্বদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। কেউ যদি তা করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ সে ভগবানের চরণে অপরাধ করে এবং পাষণ্ডী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কলিযুগে মূর্খ লোকেরা এই দুটি তত্ত্বকে সমান বলে প্রচার করে ভগবানের চরণে গর্হিত অপরাধ করে।

জড়া প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত বিভিন্ন অংশদের বিভিন্ন পদ রয়েছে, এবং তার কয়েকটি হচ্ছে কালভৈরব, শ্মশানভৈরব, শনি, মহাকালি, চণ্ডিকা ইত্যাদি। যে মানুষ তমোগুণের গভীরতম স্তরে অধিষ্ঠিত, তারাই এই সমস্ত দেবতাদের পূজা করে। ব্রহ্মা, শিব, সূর্য, গণেশ এবং এই ধরনের দেবতারা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত জড় ভোগেচ্ছু মানুষদের দ্বারা পূজিত হন। কিন্তু যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁরা কেবল বিষ্ণু-তত্ত্বদেরই আরাধনা করেন। বিষ্ণু-তত্ত্বদের বিভিন্ন নাম এবং রূপ রয়েছে। যেমন নারায়ণ, দামোদর, বামন, গোবিন্দ, অধোক্ষজ ইত্যাদি।

যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুতত্ত্বের প্রতীক 'শালগ্রাম-শিলার' আরাধনা করেন, এবং কিছু উচ্চবর্ণের মানুষ, যেমন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরাও সাধারণত বিষ্ণু-তত্ত্বের আরাধনা করে থাকে।

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত উন্নত মনোভাবাপন্ন ব্রাহ্মণেরা কখনও অন্যের পূজাপদ্ধতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। তারা বিভিন্ন দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ; কালভৈরব অথবা মহাকালীর রূপ ভয়ঙ্কর হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁদের অশ্রদ্ধা করেন না। তাঁরা খুব ভালভাবেই জানেন যে, এই ভয়ঙ্কর রূপসমন্বিত এই সমস্ত দেবতারাও পরমেশ্বর ভগবানেরই সেবক। তবে তাঁরা ভয়ঙ্কর এবং মনোরম—উভয় রূপসম্পন্ন দেবতাদেরই পূজা পরিত্যাগ করেন এবং তারা কেবল একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুরই আরাধনা করেন। কেন না তারা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী। ব্রহ্মা সহ বিভিন্ন দেবদেবীরা কখনও কাউকে মুক্তি দান করতে পারেন না। হিরণ্যকশিপু অমর হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিল, কিন্তু তার আরাধ্য দেবতা ব্রহ্মা তাকে তার ঈপ্সিত বর দান করতে পারেননি। তাই বিষ্ণুকেই কেবল বলা হয় মুক্তিপাদ, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর ভগবানই কেবল মুক্তি দান করতে পারেন। এ ছাড়া আর কাউকেই মুক্তিপাদ বলা হয় না। এই জগতের অন্য সমস্ত জীবের মত স্বর্গের দেবতারাও প্রলয়ের সময় বিনাশপ্রাপ্ত হন। তাঁরা নিজেরাই মুক্তি লাভ করতে পারেন না, সুতরাং তাঁরা তাঁদের ভক্তদের কিভাবে মুক্তি দেবেন? দেবতারা তাঁদের ভক্তদের সাময়িক কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন, কিন্তু তাদের আত্যন্তিক মঙ্গল-সাধন করতে পারেন না।

তাই মুক্তি লাভেচ্ছু ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ করেন, যদিও তাঁদের প্রতি তাঁরা অশ্রদ্ধাপরায়ণ নন।

শ্লোক ২৭

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্যপ্রজেপ্সবঃ ॥ ২৭ ॥

রজঃ—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **প্রকৃতয়ঃ**—মনোভাবাপন্ন; **সম-শীলাঃ**—সমপর্যায়ভুক্ত; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষ; **ভূত**—অন্যান্য জীবসমূহ; **প্রজেশ-আদীন্**—জগতের শাসন-কার্যের নিয়ন্ত্রক; **শ্রিয়া**—সমৃদ্ধি; **ঐশ্বর্য**—ধন এবং শক্তি; **প্রজা**—প্রজা; **ঈপ্সবঃ**—এই বাসনা করে।

অনুবাদ

যারা রজ ও তমোগুণের অধীন, তারা পিতৃপুরুষ, ভূত এবং প্রজাপতিদের পূজা করে, কেন না তারা স্ত্রী, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং সন্তান-সন্ততি আদি জড় বিষয়-ভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত।

তাৎপর্য

ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী মানুষদের কোনও দেব-দেবীর পূজা করার প্রয়োজন হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৭।২০,২৩) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যারা জড় সুখভোগের বাসনায় উন্মত্ত, তারাই কেবল অনিত্য সুখভোগের আশায় বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। এই ধরনের দেব-দেবীর পূজা কেবল অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। আমাদের কখনই জড় সুখভোগ বৃদ্ধির বাসনা করা উচিত নয়। জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু বিষয়ই গ্রহণ করা উচিত। ইন্দ্রিয়-সুখ বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে আরও গভীরভাবে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়া। অধিক ঐশ্বর্য, অধিক স্ত্রী-সম্ভোগ এবং মিথ্যা আভিজাত্যের আকাঙ্ক্ষা তারাই করে, যারা জড় জগতের প্রতি আসক্ত। এই ধরনের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা জানে না যে বিষ্ণুর আরাধনা করলে কি লাভ হয়। বিষ্ণুর আরাধনা করলে এই জীবনে তো লাভ হয়ই, উপরন্তু মৃত্যুর পরেও লাভ হয়। সে কথা ভুলে গিয়ে মূর্খ লোকেরা অধিক ঐশ্বর্য, অধিক স্ত্রী-সম্ভোগ এবং অধিক সন্তান-সন্ততি লাভের আশায় বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করে। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি করা—সেগুলি বর্ধিত করা নয়।

জড় সুখভোগের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাপন্ন হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত দেব-দেবীরাও হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সেবক-সেবিকা। তাঁরা জল, বায়ু, আগুন, আলোক ইত্যাদি সরবরাহ করার কর্তব্য সাধন করছেন ; মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠাভরে কর্ম করে সেই কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা এবং সেটিই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যথাযথভাবে এবং অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করা উচিত, এবং তার ফলে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে আমরা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে পারব।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজধামে তাঁর লীলাবিলাস করছিলেন,তখন তিনি ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে দেন এবং ব্রজবাসীদের উপদেশ দেন যে তাঁরা যেন ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তাঁদের বৃত্তি অনুসারে তাঁর সেবা করেন। জড় বিষয় লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম অনুশীলনের একটি বিকৃত রূপ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই এই ধরনের ধর্ম আচরণকে 'কৈতব ধর্ম' বলে বর্জন করা হয়েছে। সমস্ত জগতে কেবলমাত্র একটিই ধর্ম রয়েছে এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সেই ধর্ম অনুশীলন করা এবং তা হচ্ছে ভাগবতধর্ম অথবা একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করাই ধর্ম।

শ্লোক ২৮-২৯

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৮ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ২৯ ॥

বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; **পরাঃ**—পরম উদ্দেশ্য; **বেদাঃ**—বৈদিক শাস্ত্র; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরাঃ**—পূজার জন্য; **মখাঃ**—বেদবিহিত যজ্ঞ; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরাঃ**—প্রাপ্তির উপায়; **যোগাঃ**—যোগ সাধন; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরাঃ**—তার নিয়ন্ত্রণাধীন; **ক্রিয়াঃ**—সকাম কর্ম; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম্**—পরম; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরঃ**—উচ্চতর গুণ; **ধর্ম**—ধর্ম; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরাঃ**—অন্তিম; **গতিঃ**—জীবনের উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি-বিধান এবং যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। সমস্ত সকাম কর্মের চরম ফল তিনিই দান করেন। পরম জ্ঞান এবং সমস্ত তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা এবং তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আরাধনার একমাত্র বিষয়, সে কথা এই দুটি শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই ঃ তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া এবং চরমে তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবাপরায়ণ হওয়া। এইটিই হচ্ছে সমস্ত বেদের মূল তত্ত্ব। *ভগবদ্গীতাতে*ও সেই সত্যকে প্রতিপন্ন করে ভগবান বলেছেন ঃ সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। সমস্ত শাস্ত্র তিনি রচনা করেছেন তাঁর অবতার শ্রীল ব্যাসদেবের মাধ্যমে, যাতে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ অধঃপতিত জীবেরা তাঁকে (পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে) জানতে পারে। কোন দেবতাই জড় জগতের বন্ধন থেকে জীবকে মুক্তি দান করতে পারেন না। সে কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষিত হয়েছে। ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তাকে খর্ব করে তাঁকে জীবেদের সমপর্যায়ভুক্ত করে, এবং সেই জন্য বহু সাধ্যসাধনা করেও নির্বিশেষবাদীরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।

বহু বহু জন্মের পর পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে তারা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হতে পারে।

এখানে কেউ তর্ক করে বলতে পারে যে, বৈদিক কার্যকলাপ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সে কথা সত্যি। কিন্তু এই সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাসুদেবকে তত্ত্বত জানা। বাসুদেবের আরেক নাম হচ্ছে যজ্ঞ, এবং *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত যজ্ঞ এবং সমস্ত কর্মসমূহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সাধিত হওয়া উচিত। যোগের উদ্দেশ্যও তাই। 'যোগ' কথাটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসা। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্য আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি কতকগুলি অঙ্গ রয়েছে, এবং সে সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে বাসুদেবের প্রকাশ পরমাত্মায় চিত্তকে একাগ্র করা। পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে আংশিকভাবে বাসুদেব উপলব্ধি, এবং যখন কেউ সেই প্রচেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি পূর্ণরূপে বাসুদেবকে জানতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ যোগীরাই যোগ-অনুশীলনের মাধ্যমে কতকগুলি যোগসিদ্ধি লাভ করে সেই সিদ্ধির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ধরনের ভ্রষ্ট যোগীরা পরবর্তী জীবনে শুচিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অথবা শ্রীসম্পন্ন বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করে বাসুদেব উপলব্ধির অপূর্ণ কার্য পূর্ণ করার সুযোগ পায়। এই ধরনের ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ অথবা ধনবান বণিকের পুত্ররা যদি এই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে, তা হলে তারা সাধুসঙ্গের প্রভাবে অনায়াসে বাসুদেবকে জানতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ধরনের ভাগ্যবান মানুষেরা আবার জড় ঐশ্বর্য এবং যশের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়।

জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে এই একই অবস্থা হয়। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, জ্ঞান আহরণের আঠারোটি অঙ্গ রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় জ্ঞান আহরণ করার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে অমানী, অদাম্ভিক, অহিংস, ক্ষান্ত, সরল, সদ্গুরুর অনুগত এবং আত্মসংযমী হন। জ্ঞান আহরণের ফলে বিজ্ঞ মানুষ বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন হন। সমস্ত জ্ঞানই চরমে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। তাই বাসুদেব হচ্ছেন সমস্ত জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। যে জ্ঞান মানুষকে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করে বাসুদেবের দর্শন লাভ করায়, তাই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান। জড়জাগতিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে *ভগবদ্গীতায়* অজ্ঞান বলে বর্জন করা হয়েছে। জড়জাগতিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখভোগ, যার অর্থ হচ্ছে জড় অস্তিত্ব বৃদ্ধি, অর্থাৎ ত্রিতাপ-দুঃখ বৃদ্ধি। তাই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জড়জাগতিক অস্তিত্ব বৃদ্ধি হচ্ছে অজ্ঞান। কিন্তু সেই জ্ঞান যখন পারমার্থিক জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে, তখন দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবনের সমাপ্তি হয় এবং বাসুদেব স্তরে পারমার্থিক জীবনের শুরু হয়।

সব রকমের তপস্যারও এই একই উদ্দেশ্য। 'তপস্যা' কথাটির অর্থ হচ্ছে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে দৈহিক কষ্ট স্বীকার করা। রাবণ এবং হিরণ্যকশিপু জড় বিষয়-ভোগের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করেছিল। আধুনিক যুগের রাজনীতিবিদদেরও মাঝে মাঝে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করতে দেখা যায়। কিন্তু এগুলি যথার্থ তপস্যা নয়। তপস্যা কেবল বাসুদেবকে জানার উদ্দেশ্যেই সাধন করা উচিত। বাসুদেবকে জানার জন্য যখন দৈহিক কষ্ট বা অসুবিধা স্বীকার করা হয় সেটি হচ্ছে যথার্থ তপস্যা। এ ছাড়া অন্য সব রকম তপস্যাই রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। রজ এবং তমোগুণ জীবের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি করতে পারে না। সত্ত্বগুণই কেবল ত্রিতাপ-দুঃখ নিবৃত্তি করতে পারে; শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা বসুদেব এবং দেবকী তাঁকে তাঁদের সন্তানরূপে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা (*ভগবদ্গীতা* ১৪/৪)। তাই তিনি হচ্ছেন সমস্ত চেতন বস্তুর পরম চেতন। তিনি হচ্ছেন সমস্ত ভোক্তাদের মধ্যে পরম ভোক্তা। তাই কেউই তাঁর পিতা হতে পারে না, যেভাবে মূর্খ লোকেরা অনেক সময়ে মনে করে থাকে। বসুদেব এবং দেবকীর কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হতে সম্মত হন। তাই যদি তপস্যা করতে হয়, তবে তা যেন অবশ্যই জ্ঞানের পরম লক্ষ্য বাসুদেবকে জানবার জন্য সাধিত হয়।

বাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সে কথা পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে অনন্তরূপে বিস্তার করেন। তাঁর এই বিভিন্ন প্রকাশ সম্ভব বিভিন্ন শক্তির দ্বারা। তাঁর শক্তিও অনন্ত, এবং তার মধ্যে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে উৎকৃষ্ট শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে নিকৃষ্ট শক্তি। *ভগবদ্গীতায়* এই দুই শ্রেণীর শক্তিকে ভগবানের পরা এবং অপরা প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে (৭/৪৬)। তাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তাঁর যে বিভিন্ন প্রকাশ হয় সেই রূপগুলি হচ্ছে উৎকৃষ্ট এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তাঁর যে প্রকাশ হয় তা হচ্ছে নিকৃষ্ট। জীবও তাঁর প্রকাশ। যে সমস্ত জীব তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতিতে প্রকাশিত, তারা নিত্যমুক্ত জীব, আর যারা তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতিতে অবস্থিত, তারা নিত্যবদ্ধ জীব। তাই, সমস্ত জ্ঞানের প্রয়াস, তপশ্চর্যা, দান এবং কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। এখন আমরা সকলে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি, এবং এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের চিন্ময় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মহাত্মা হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং তার ফলে যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়েছেন। তাঁরা ভগবানের অন্তরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। তাই এই মহৎ আশয়সম্পন্ন পুরুষেরা নিরন্তর অনন্য ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত। এইটিই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এবং সমস্ত বৈদিক

শাস্ত্রে সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। সকাম কর্মে অথবা শুষ্ক জ্ঞানের প্রয়াসে অনর্থক যুক্ত হওয়া উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই মুহূর্তে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। এই জগতে সৃষ্টি, স্থিতি অথবা বিনাশকার্যে ভগবানের সহায়ক যে সমস্ত দেব-দেবী রয়েছেন, তাঁদের পূজা করে সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। অসংখ্য শক্তিশালী দেব-দেবী রয়েছেন, যাঁরা ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি এই জড় জগতের পরিচালনার তত্ত্বাবধান করেন। তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের সহকারী। এমন কি শিব এবং ব্রহ্মাও এই সমস্ত দেবতাদের পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু অথবা বাসুদেব সর্বদাই পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত। তিনি যদিও এই জড় জগতের সত্ত্বগুণকে স্বীকার করেন, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। সেই তত্ত্ব আরও স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কারাগারে কয়েদি রয়েছে এবং কারাগারের পরিচালকরা রয়েছে। কারাগারের কয়েদি এবং পরিচালক উভয়েই রাজার আইনের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু রাজা যদি কখনও কারাগারে আসেনও, তবুও তিনি কারাগারের আইনের দ্বারা বদ্ধ হন না। তাই সর্ব অবস্থাতেই রাজা কারাগারের নিয়মকানুনের অতীত। ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও এই জড় জগতের সমস্ত নিয়ম-কানুনের অতীত।

শ্লোক ৩০

স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ—তা; **এব**—অবশ্যই; **ইদম্**—এই; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছেন; **অগ্রে**—পূর্বে; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **সৎ**—কারণ; **অসৎ**—পরিণাম; **রূপয়া**—রূপের দ্বারা; **চ**—এবং; **অসৌ**—সেই ভগবান; **গুণময়**—জড় জগতের গুণে; **অগুণঃ**—গুণাতীত; **বিভুঃ**—পরম।

অনুবাদ

এই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নির্গুণ হয়ে প্রথমে কার্য-কারণাত্মিকা ত্রিগুণময়ী স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে নিরীক্ষণ করে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বদাই নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত, কেন না এই জড় জগতের সৃষ্টির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সেগুলিও তাঁরই সৃষ্টি। তাই তিনি জড় জগতের গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাঁর সত্তা, রূপ, কার্যকলাপ ইত্যাদি জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও

ছিল।* তিনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। সেই গুণগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ৩১

তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ ॥ ৩১ ॥

তয়া—তাদের দ্বারা; **বিলসিতেষু**—উদ্ভূত হলেও; **এষু**—এই সমস্ত; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণগুলি; **গুণবান্**—গুণের দ্বারা প্রভাবিত; **ইব**—যেন; **অন্তঃ**—মধ্যে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **আভাতি**—প্রতিভাত হয়; **বিজ্ঞানেন**—চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা; **বিজৃম্ভিতঃ**—পূর্ণ জ্ঞানময়।

অনুবাদ

জড় জগৎ সৃষ্টি করার পর ভগবান (বাসুদেব) নিজেকে বিস্তার করে তার মধ্যে প্রবেশ করেন। যদিও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে অবস্থিত এবং যদিও মনে হয় যে এই জড় জগতে তাঁর সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং পূর্ণ জ্ঞানময়।

তাৎপর্য

জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং বদ্ধ জীবেরা, যারা চিন্ময় ভগবদ্ধামের অযোগ্য, তারা পূর্ণরূপে জড় বস্তুকে ভোগ করার জন্য এই জড় জগতে প্রক্ষিপ্ত হয়। পরমাত্মা এবং জীবের পরম সুহৃৎরূপে পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে বিস্তার করে জড় জগতকে ভোগ করার বিষয়ে জীবকে সাহায্য করার জন্য এবং তার প্রতিটি কার্যকলাপের সাক্ষী হওয়ার জন্য সর্বক্ষণ জীবের সঙ্গে থাকেন। জীব যখন জড় জগতকে ভোগ করে, ভগবান তখন জড়া প্রকৃতির পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতি বজায় রাখেন। বৈদিক শাস্ত্রে (শ্রুতিতে) বলা হয়েছে, একটি বৃক্ষে দুটি পাখি বসে রয়েছে।* সেই পাখি দুটির একটি পাখি গাছের ফল খাচ্ছে, এবং অন্য পাখিটি অপর পাখিটির কার্যকলাপের সাক্ষী থাকছে। সাক্ষী হচ্ছেন ভগবান, আর ফল ভক্ষণরত পাখিটি হচ্ছে জীব। ফল-ভক্ষণরত জীব তার প্রকৃত স্বরূপের

---

* মায়াবাদী সম্প্রদায়ের শিরোমণি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাঁর ভগবদ্গীতার ভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত স্থিতি স্বীকার করেছেন।

* *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।*
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

(মুণ্ডক উপনিষদ ৩/১/১)

কথা ভুলে গেছে এবং জড়া প্রকৃতির সকাম কর্মে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরমাত্মা সর্ব অবস্থাতেই চিন্ময়, জ্ঞানময়। সেটিই হচ্ছে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মধ্যে পার্থক্য। জীবাত্মা প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু পরমাত্মা সর্ব অবস্থাতেই জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর।

শ্লোক ৩২

যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥ ৩২ ॥

যথা—যতখানি; **হি**—ঠিক তেমন; **অবহিতঃ**—নিহিত; **বহ্নিঃ**—অগ্নি; **দারুষু**—কাঠে; **একঃ**—এক; **স্ব-যোনিষু**—প্রকাশের উৎস; **নানেব**—প্রকাশের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন; **ভাতি**—প্রকাশ করে; **বিশ্বাত্মা**—পরমাত্মারূপে ভগবান; **ভূতেষু**—জীবের মধ্যে; **চ**—এবং; **তথা**—সেই রকম। **পুমান্**—পরম পুরুষ।

অনুবাদ

আগুন যেমন কাঠের মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও পরমাত্মারূপে সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। যদিও তিনি অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, তবুও মনে হয় তিনি যেন নানারূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব তাঁর এক অংশের দ্বারা নিজেকে সমস্ত জড় জগতে বিস্তার করেন এমন কি অতি ক্ষুদ্র পরমাণুতেও তিনি রয়েছেন। জড় পদার্থ, অ-জড় বা চিন্ময় পদার্থ, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি ভগবানের পরমাত্মা স্বরূপের বিভিন্ন পরিণাম। যেমন কাঠ থেকে আগুনের প্রকাশ হয়, অথবা দুধ থেকে মাখন তৈরি হয়, তেমনই উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রের অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে পরমাত্মারূপে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ ভাষ্য। পারমার্থিক তত্ত্ব শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়, এবং সেটিই হচ্ছে এই অপ্রাকৃত বিষয় জানবার একমাত্র পন্থা। অন্য আগুনের সংযোগে যেমন কাঠের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনিই দিব্য কৃপার প্রভাবে মানুষের দিব্য চেতনা প্রকাশিত হয়। দিব্য কৃপার মূর্ত বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব, এবং কাষ্ঠ সদৃশ জীবের মধ্যে তিনি সেই দিব্য অগ্নি প্রজ্বলিত করতে পারেন পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে। তাই পারমার্থিক জ্ঞান শ্রবণ করার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হয়, এবং তার ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের অপ্রাকৃত স্থিতি উপলব্ধি করা যায়। পশু এবং মানুষের মধ্যে এটাই হচ্ছে পার্থক্য—মানুষ যথাযথভাবে শ্রবণ করতে পারে, কিন্তু একটা পশু তা পারে না।

শ্লোক ৩৩

অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্মিতেষু নির্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্ ॥ ৩৩ ॥

অসৌ—সেই পরমাত্মা; **গুণময়ৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; **ভাবৈঃ**—স্বাভাবিকভাবে; **ভূত**—সৃষ্ট; **সূক্ষ্ম**—সূক্ষ্ম; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আত্মভিঃ**—জীবের দ্বারা; **স্ব-নির্মিতেষু**—তাঁর নিজের সৃষ্টিতে; **নির্বিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করান; **ভূতেষু**—জীবেদের মধ্যে; **তৎ-গুণান্**—প্রকৃতির সেই গুণগুলি।

অনুবাদ

পরমাত্মা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর সৃষ্ট জীবেদের দেহে প্রবেশ করেন এবং সূক্ষ্ম মনের দ্বারা তাদের এই সমস্ত গুণগুলির প্রতিক্রিয়া ভোগ করান।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন রকমের জীব-শরীরে সকলেই তাদের সূক্ষ্ম মন এবং স্থূল শরীরের বাসনা অনুসারে জড় জগতকে ভোগ করছে। সূক্ষ্ম মন অনুসারে স্থূল জড় শরীর গঠিত হয়, এবং জীবের বাসনা অনুসারে তার ইন্দ্রিয়গুলির সৃষ্টি হয়। পরমাত্মারূপে ভগবান জীবকে জড়-সুখ ভোগ করতে সাহায্য করেন, কেন না তার বাসনা অনুসারে কোন কিছু লাভ করতে জীব সম্পূর্ণভাবে অসহায়। জীব অভিপ্রায় করে এবং ভগবান তা অনুমোদন করেন। অর্থাৎ, জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তারা ভগবানের সঙ্গে এক। *ভগবদ্গীতাতেও* ভগবান সমস্ত জীবকে তাঁর সন্তান বলে ঘোষণা করেছেন। সন্তানদের সুখ এবং দুঃখ ভোগ পরোক্ষভাবে পিতার সুখ এবং দুঃখ ভোগ। তবুও পিতা সরাসরিভাবে পুত্রদের সুখ ও দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবান এতই কৃপালু যে তিনি পরমাত্মারূপে সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকেন এবং সর্বদাই তাদের মোহ-অন্ধকার দূর করে যথার্থ আনন্দের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

শ্লোক ৩৪

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্যঙ্ নরাদিষু ॥ ৩৪ ॥

ভাবয়তি—পালন করেন; **এষঃ**—এই সমস্ত; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **লোকান্**—সমগ্র জগতে; **বৈ**—সাধারণত; **লোক-ভাবনঃ**—সমগ্র জগতের ঈশ্বর; **লীলা**—

লীলা; **অবতার**—অবতার; **অনুব্রতঃ**—অনুব্রত; **দেব**—দেবতা; **তির্যক্**—নিম্ন স্তরের পশু; **নরাদিষু**—মানুষদের মধ্যে।

অনুবাদ

এইভাবে সমস্ত জগতের পতি দেবতা, মনুষ্য এবং পশু অধ্যুষিত সমস্ত গ্রহ লোকগুলি প্রতিপালন করেন। বিভিন্ন অবতারে তিনি তাঁর লীলা-বিলাস করে বিশুদ্ধ-সত্ত্বেও অধিষ্ঠিত জীবসমূহকে উদ্ধার করেন।

তাৎপর্য

অনন্ত কোটি জড় ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে, যেখানে অসংখ্য জীব প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিরাজ করছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে এবং প্রতিটি লোকে অবতরণ করেন। তিনি বিভিন্ন লোকে জীবেদের মাঝে তাঁর লীলাবিলাস করেন, যাতে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষী হয়। ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতির পরিবর্তন করেন না, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন সমাজে তিনি বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছেন বলে মনে হয়।

কখনও কখনও তিনি কোন উপযুক্ত জীবকে তাঁর হয়ে কোন কর্ম সাধন করার জন্য তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট করেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হচ্ছে একই—ভগবান চান যে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবেরা যেন ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে নিত্য আনন্দ লাভ করতে পারে। যে আনন্দ লাভের আশায় জীব আকুল হয়ে রয়েছে, তা এই জড় জগতের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে নিত্য আনন্দের অন্বেষণ জীব করছে তা কেবল ভগবদ্ধামেই পাওয়া যায়; কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন জীবের ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। তাই ভগবান নিজে এসে অথবা তাঁর উপযুক্ত পুত্রসদৃশ প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে বদ্ধ জীবদের কাছে ভগবদ্ধামের মহিমা প্রচার করেন। এই ধরনের অবতারেরা অথবা ভগবানের পুত্রেরা কেবল মানব সমাজের মধ্যেই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বাণী প্রচার করেন না, তাঁরা দেবতা আদি অন্যান্য সমাজেও সেই বাণী প্রচার করেন।

ইতি—"দিব্য ভাব এবং দিব্য সেবা" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।